পুরুষ ও রমণী

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পুরুষ ও রমণী

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্রালয়

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ বসু

কল্যাণবরেষু—

এই লেখকের লেখা—

মনে ছিল আশা

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্

রজনীগন্ধা

দুর্ঘটনা

নববধূ

ভাড়াটে বাড়ী

নবযৌবন

প্রভাত-সূর্য্য

বহু বিচিত্র

রাত্রির তপস্যা

চতুর্দ্দোলা

—ছোটদের—

পৃথিবীর ইতিহাস

বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন (১ম খণ্ড)

বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন (২য় খণ্ড)

দেশবিদেশের লেখাপড়া

দেশবিদেশের ধর্ম্ম

আমাদের পৃথিবী

দেশ বিদেশে

এ টেল অফ টু সিটিজ্

ছেলেদের আরব্য-উপন্যাস

শিশু রামায়ণ

শিশুদের মহাভারত

জললোকের কথা

সাহসের নেশা

ভিক্টর হুগোর গল্প

কাউন্ট অফ মণ্টেক্রীষ্টো

ডিকেন্সের গল্প

ইউরোপের সেরা সাহিত্যিক

তরুণ গুপ্তের বিচিত্র কীর্ত্তি কথা

প্রভৃতি—

পুরুষ ও রমণী

সুকুমারের বিবাহের ইতিহাসটা যেমন বিচিত্র, তেমনি কুৎসিত।

সে বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়া শেষ করিলে পাছে দেশে গিয়া জমিদারীর কাজ শিখিতে হয়, এই ভয়ে সে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ আইন পড়িবার নাম করিয়া হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে পড়িয়া আছে, আর নানা অজুহাতে পরীক্ষাটাকে এড়াইয়া যাইতেছে। হাতখরচা পায় প্রচুর এবং বলাই বাহুল্য, তাহা বন্ধুবান্ধবদের আনন্দ দিতেই প্রায় সবটা খরচ করে। সে যখনই সিনেমায় যায় বা চাঙ্গুয়ায় ভোজের আয়োজন করে, তখনই অন্তত সাত-আটটি বন্ধু তাহার সঙ্গে থাকে।

এই সব নানা কারণে বন্ধুবান্ধব-মহলে তাহার প্রতিপত্তির সীমা ছিল না, তাই সকলেই যখন-তখন তাহাকে মুরুব্বি ধরিত। সব সময় ঠিক যে তাহাকে খুশী করিবার জন্য তা নয়, কতকটা অভ্যাসেও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এমনি একটা সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই সতীশ আসিয়া সেদিন তাহাকে চাপিয়া ধরিল, সুকুমারকে তাহার সহিত মেয়ে দেখিতে যাইতে হইবে। যাইতেই হইবে, নহিলে সতীশের দেখিতে যাওয়ার কোন অর্থ থাকিবে না, কারণ আর কাহারও মতামতের কোন মূল্য নাই।

সুকুমার এ অনুরোধে বিস্মিত হইল না, সে জানিত যে এ সব অনুরোধ তাহারই প্রাপ্য। তবে সে সহজে রাজীও হইল না, হাতঘড়িটা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কিন্তু তুই যে বলছিস এগারোটায় গাড়ী, তার মানে ত এখনই বেরোতে হবে। যেটুকু সময় আছে, কামানো আর চান করার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। অথচ বিনোদও একবার বিশেষ ক'রে সকালে যেতে বলেছিল, কী যেন তার দরকার আছে, না গেলে কি মনে

করবে বল্ দেখি ?...আমি বলি কি, তার চেয়ে আজ বরং তুই একাই যা, আমি না হয় সেই পাকা-দেখার দিন যাব'খন—

কিন্তু সতীশ ছাড়িল না, তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সে হয় না সুকুমার, হাজার হোক তোরা হলি আর্টিস্ট লোক, তোরা একটা ওপিনিয়ন না দিলে কিছু ঠিক করতেই পারব না। বিনোদের যা দরকার তা না হয় সন্ধ্যেবেলাই হবে।

সুকুমার বাল্যকালে স্কুল ম্যাগাজিনে গুটি-কয়েক কবিতা ও গল্প লিখিয়াছিল এবং নিতান্ত বড়লোকের ছেলে বলিয়া সেগুলা ছাপাও হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আর সে-সব কোন বালাই-ই নাই, তবু তাহার বন্ধুরা, যাহারা চিরকাল তাহার পয়সায় সিনেমা দেখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দেখিবার আশা রাখে, তাহারা সবাই জানে যে, 'আর্টিস্ট' আখ্যাতেই সুকুমার খুশী হয় সবচেয়ে বেশী। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না, সতীশের এক চালেই সুকুমার মাত হইল, তাহার কাঁধটা চাপড়াইয়া কহিল, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। ফিরে এসেই বিনোদের সঙ্গে দেখা করব'খন্।...তুই যা তাহ'লে চট ক'রে সেরে আয়, আমিও তৈরী হয়ে নি—

সতীশ লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল, কিন্তু সুকুমার সাময়িক দুর্বলতায় এমন একটা শ্রমসাধ্য ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়া ফেলিয়াই অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। মেয়ে সে ইতিপূর্বে আরও বহুবার দেখিতে গিয়াছে, সুন্দর মেয়ে কোথাও দেখিতে পায় নাই, বাঙলাদেশে ও বস্তুটি নাই বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। সুতরাং এই রৌদ্রে বৃথা এতখানি পথ যাইবার কল্পনাতে সে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং নিজেকে ও সতীশকে, উভয়কেই নির্বোধ বলিয়া গালি দিতে লাগিল।

এমন কি, পাশের ঘরের বিজয় আসিয়া যখন প্রশ্ন করিল, 'কিরে, এত সকাল সকাল কামাচ্ছিস কেন ? তখনও তাহার বিরক্তি যায় নাই, সে মুখখানা বিকৃত করিয়া জবাব দিল, আর বলিস কেন, আমার রিপন

কলেজের এক ফ্রেণ্ড মেয়ে দেখতে যাবে, আমাকে ধরে টানাটানি—যেতেই হবে সঙ্গে। এ সব কি পোষায়?

বিজয় অর্থপূর্ণ একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, ভালই ত, আজ তাহ'লে ত তোর দিন ভাল যাবে দেখছি, একটি সুন্দরী কিশোরীর দর্শন পাবি, এ কি কম ভাগ্যের কথা?

সুকুমার অবজ্ঞাভরে জবাব দিল, হ্যাঁ তুইও যেমন। ওসব কাব্য কেতাবেই ভাল, তা ছাড়া সে জায়গা যে কী এখনও ত তা শুনিস নি। মার্টিন কোম্পানীর গাড়ীতে চেপে কোন্ এক অজ স্টেশনে নামতে হবে, আবার সেখান থেকে হাঁটতে হবে মাইল-খানেক। একে ত ঐ বন-দেশের মেয়ে, তায় আবার বাপের শুনলুম বিড়ির দোকান আছে; সে যে কি মেয়ে হবে তা বুঝতেই পারছি। মিছিমিছি কষ্টভোগ অদৃষ্টে আছে আর কি!

বিজয় বিস্মিত হইয়া কহিল, তাই নাকি! তা সে ভদ্রলোকেরও ত সখ কম নয়, সেইখানে যাচ্ছেন মেয়ে দেখতে?

গালের উপর সাবানটা ঘষিতে ঘষিতে সুকুমার জবাব দিল, ঐ বলে কে! সতীশটার বরাবরই ঐ রকম বুদ্ধি। ঘটক বলেছে সুন্দর মেয়ে, ও অমনি বিশ্বাস ক'রে বসে আছে। ঘটক যখনই বলে পরমাসুন্দরী, আমি ত তখনই গিয়ে দেখি যে সে সব মেয়ের দিকে চাওয়া যায় না।···কিন্তু ওকে সে কথা কে বোঝাবে বলো!...না গেলে মনে কষ্ট পাবে, তার চেয়ে আমিই না হয় কষ্ট করলুম একটু, এই ভেবে যাওয়া।

কিন্তু সুকুমারের যাহাতে কষ্ট না হয়, সতীশ সেজন্য আগেই সতর্ক হইয়াছিল। সে ট্যাক্সী লইয়াই হাজির হইল এবং কদমতলা স্টেশনে গিয়াও একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনিয়া বসিল। এ ব্যবস্থায় সুকুমার খুশী হইল বটে, কিন্তু মুখে পরিহাস করিতেও ছাড়িল না, আচ্ছা এত পয়সা কার জন্যে খরচ কচ্ছিস বল্ ত? যাচ্ছিস্ ত বিড়িওলার মেয়ে দেখতে।

সেই বনগাঁয়ে যদি না একটা কালো ভূত মেয়ে এসে হাজির হয় ত কি বলেছি! চুলগুলো টেনে ওপরঝুঁটি ক'রে বাঁধা, চুই রগে সর্ষের তেল গড়িয়ে পড়ছে, খাটো কাপড় আর তার ওপর মন-ভোলানোর জন্যে মধ্যে মধ্যে এক থাবলা ক'রে পাউডার, নয়ত এরারুট মাখানো—সে ছবি আমি পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি!

সতীশ লজ্জিত হইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, পয়সা কি আর তার জন্যে খরচ করছি? তোর কষ্ট হবে তাই,—এই ঠিক দুপুর-বেলা টেনে আনলুম তোকে!

তাহার পর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কি জানি ভাই, ঘটক-ত বাজী রেখেছে, যদি পছন্দ না হয় ত এই সমস্ত খরচা সে দেবে—

তাচ্ছিল্যের স্বরে সুকুমার কহিল, হ্যাঁ, তুইও যেমন। ঘটকেরা আবার কবে সত্যি কথা বলে?

কিন্তু সুকুমারকে কষ্ট না দিবার জন্য সতীশ এধারে যত আয়োজনই করুক, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল স্টেশনে পা দিতেই। ঘটক ভরসা দিয়াছিল হাঁটিতে হইবে না, স্টেশনে অন্তত পাল্কী পাওয়া যাইবে নিশ্চয়ই, কিন্তু নামিয়া দেখা গেল সে সব কিছুই নাই। কন্যার ভাই অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে আসিয়াছিল, সে এবং ঘটক বার বার ক্ষমা চাহিতে লাগিল, কিন্তু তখন সেই রৌদ্রে দেড় মাইল পথ মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিবার প্রস্তাব সুকুমারের সর্বাঙ্গে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল। অথচ উপায়ই বা কি? সে মনে মনে সতীশের প্রতি বিশুদ্ধ ইংরাজী গালাগালিগুলি প্রয়োগ করিতে করিতে অগত্যা হাঁটিতেই শুরু করিল।

এই ব্যাপারে সতীশেরও লজ্জার সীমা রহিল না। বিশেষত এত কষ্টের পর গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া যখন দেখা গেল যে বাড়িটার চালা-ঘরগুলি প্রায় সবই পড়োপড়ো অবস্থায় পৌঁছিয়াছে এবং তাহার ঘরে গিয়া বসিতেই যে-সব ছেলেমেয়ের দল আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া

দাঁড়াইল, তাহার প্রত্যেকেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত—যেমন শীর্ণ, তেমনি পাণ্ডুর—শ্রী তাহাদের কাছেও কোন দিন যায় নাই।

সুকুমার চুপি চুপি সতীশকে কহিল, নমুনা দেখছিস ত?...আর তা ছাড়া ঘটক যে কেমন সত্যকথা বলেছে তার নমুনা ত স্টেশনেই পেলি!

সতীশ অত্যন্ত দমিয়া গেল। এখনও পর্য্যন্ত একটু ক্ষীণ আশা ছিল মনের মধ্যে, কিন্তু উপস্থিত ছেলেমেয়েগুলির দিকে চাহিয়া সত্যই সে হতাশ হইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কন্যার ভাইকে বলিল, এই তিনটের ট্রেণ মিস্ করলে চলবে না, খুব চট্‌পট্ ব্যবস্থা ক'রে ফেলুন।

কন্যাপক্ষ যথাসাধ্য জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেগুলি সবিনয় অনুরোধ সত্ত্বেও কেহ গ্রহণ করিল না, শুধু দুইজন দুই গ্লাস ডাবের জল মাত্র খাইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু একটু পরেই যখন পাত্রী আসিয়া পৌছিল, তখন দুইজনেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ যেন বিশ্বাস করা কঠিন। দুইজনেই মূঢ় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, ব্যাপারটা যেন কাহারও মাথার মধ্যেই প্রবেশ করিল না।

একখানি পুরাতন শান্তিপুরী কাপড় পরা—পরা কেন তাহাকে জড়ানো বলাই উচিত—চুলগুলিও, সুকুমারের ভাষায় টানিয়া ওপরঝুঁটি করিয়া বাঁধা এবং রগ দিয়া ঠিক তেল গড়াইয়া না পড়িলেও কোনরূপ প্রসাধনের চেষ্টা মাত্র যে করা হয় নাই তাহা বোঝা যায়; এমন কি, একটু এরারুটও বোধ হয় জোটে নাই। কিন্তু এই অযত্নও তাহার স্বাভাবিক রূপকে ম্লান করিতে পারে নাই—সেদিকে চাহিয়া সুকুমারের মনে হইল যেন জ্যোৎস্নার সুষমা মূর্তি ধরিয়া মর্ত্যে নামিয়া আসলেন, কোন মতেই, কোন ভাষাতেই সে রূপ বর্ণনা করা যায় না। মুখশ্রী বা গঠনে কোথাও যে খুঁত নাই তাহা নয়, কিন্তু সে দিকে চাহিলেই পলকে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়, চোখের আড়াল না হইলে কোন ত্রুটীই নজরে পড়ে না।

পুরুষ ও রমণী

কন্যার পিতা আশঙ্কা ও আশায় বিবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া, ছেলেমেয়েগুলিও নিস্তব্ধ. কন্যা নতমুখী আর ইহাদের এই বিহ্বল অবস্থা! কিছুক্ষণ পরে ঘটকই সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, একটু কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, বাবু, তাহ'লে কি জিগ্যেস-টিগ্যেস করবেন করুন—

সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল সতীশের প্রথম। সে সুকুমারের হাঁটুতে একটা আঙ্গুলের গোঁজা দিয়া চুপি চুপি কহিল, নাম জিগ্যেস কর্ না—

সুকুমারের যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিল। সে আকারণে একবার রুমালটা মুখের উপর বুলাইয়া লইয়া কহিল, আপ—তোমার নাম কি?

মেয়েটির বয়স কম। ষোলর বেশী হইবে না, যদিও দেখায় আরও অল্প। সুতরাং তাহাকে আপনি বলিতে গিয়া সঙ্কোচে বাধিল।

সে কিন্তু প্রথমটা জবাব দিতে পারিল না। কোলের উপর জোড়-করা হাত দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, গলাতেও সহজে স্বর বাহির হইল না। ঘটক বলিল, বলো মা, নাম বলো, লজ্জা কি? এঁরা সব রাজপুত্র এসেছেন, এঁদের কাছে কি ভয় করতে আছে?

তখন কোন মতে সে বলিয়া ফেলিল, শ্রীইন্দিরা দেবী।

সামান্য দুটি শব্দ, ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু তবু মনে হইল কণ্ঠস্বর মধুরই। কেমন একটা মিষ্ট অস্পষ্টতা, তাহার সহিত কিছু যেন আবেগের সুর মিশানো।

আবার কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। তখন ঘটকই পুনশ্চ সুকুমারকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বাবু, আর কিছু জিজ্ঞাসা করুন—

সুকুমার ঘাড় নাড়িল। সতীশও মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আর কি জিগ্যেস করব!

ইন্দিরা কোন মতে ঘাড় নীচু করিয়া একটা নমস্কার সারিয়া চলিয়া গেল। সতীশও একবার হাত-ঘড়িটায় চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিল, তাহ'লে ত এইবার উঠতে হয়, গাড়ীর ত আর বিশেষ দেরী নেই—

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দিরার বাবা আসিয়া হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে প্রশ্ন করিলেন, তাহ'লে আমরা কি আশা রাখতে পারি?

সতীশ একবার স্কুমারের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু সে মুখ যেন পাথর, তখন নিজেই একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আচ্ছা, আমি আচার্য্যিকে দিয়ে খবর দেব এখন! একটু ভেবে দেখি—

ঘটক ছাতিটা বগলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সে তুমি ভেবো না ভাই, আমি যখন আছি তখন ঠিক ক'রে দেবই—

তাহার পর যথারীতি শিষ্ট সম্ভাষণের পালা শেষ করিয়া সকলেই বাহির হইয়া পড়িল। ইন্দিরার বাবা কিছুদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া আর একদফা ভিক্ষা জানাইয়া বিদায় লইলেন।

২

স্কুমার ভিতরে যতক্ষণ ছিল একটি কথাও বলে নাই। এখন বাহিরে আসিয়াও, সেই খর-রৌদ্রের মধ্যেই, এমন দ্রুত হাঁটিতে শুরু করিল যে, ঘটক ত পিছাইয়া পড়িলই, সতীশও তাহার সঙ্গ রাখিতে গিয়া হাঁপাইয়া উঠিল।

খানিকটা পরে সতীশ কহিল, কি রে, কেমন দেখলি?

স্কুমার আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, মন্দ নয়, তবে নাকটা যেন কেমন টেপা, আর—

সতীশ বলিল—আর কি?

—আপার লিপটাও একটু যেন বেশী উঁচু।

সতীশ একটু ক্ষুণ্ণ হইল। কারণ সে সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তবু মোটের ওপর মন্দ নয়, কি বলিস?

সুকুমার কহিল, না তা নয়। তবে কী জানিস—এ সব একটু ভেবে চিন্তে ঠিক করাই দরকার। শুধু মেয়ের চেহারাটাই ত বড় কথা নয়। অবস্থা ত দেখলি—ও মেয়ে বিয়ে করা মানে ঐ সমস্ত ফ্যামিলিটি তোর ঘাড়ে চাপা।

সতীশ বলিল, তা বটে। তবে আমার একটা সুবিধে আছে, আমি বোধ হয় শীগ্‌গিরই বাইরে একটা চাকরী পাব। সেখানে নিয়ে গিয়ে যদি রাখি, তাহ'লে আর এরা আমার নাগাল পাবে কি ক'রে? এখানে বেশী না পাঠালেই চলবে, বুঝছিস না?

সুকুমার চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা পরে সতীশ বলিয়া ফেলিল, আমার কিন্তু ভাই বেশ লেগেছে, যাই বলিস্।

সুকুমারের ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে কহিল, তোর কথা ছেড়ে দে, যা বিয়ে-পাগলা হ'য়ে উঠেছিস তুই। নইলে এইখানে কেউ মেয়ে দেখতে আসে—

তাহার পর একটু গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, অত চট্ ক'রে কিছু ঠিক করিস্‌নি সতীশ, ভাল ক'রে ভেবে দেখ। তোর আত্মীয়-স্বজনদের জানা, তাঁদের মত নে আগে, তবে কথা দিস্—

সতীশ কহিল, আত্মীয় আর আমার বিশেষ কই, থাকবার মধ্যে মা আর মামা। মামা অত মাথা ঘামাবে না, আমি যা বলব তাতেই রাজী হবে। আর মা-ই বা এসব কি বুঝবে বল্?...তবু দেখি ব'লে একবার—

সুকুমার আর কথা কহিল না। গাড়ীতে উঠিয়াও সে সেই যে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিল, কদমতলার আগে আর একবারও চোখ খুলিল না। রৌদ্রে তাহার খুব কষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া সতীশও অপ্রস্তুতভাবে চুপ করিয়া রহিল, কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না। তা-ছাড়া পাত্রীর অলোকসামান্য রূপ তাহাকে দস্তুরমত বিভ্রান্ত করিয়া

তুলিয়াছিল, সে তখন ব্যাপারটা একটু মনে মনে অনুভব করিতে চায়।...

কদমতলায় নামিয়াই সতীশ তাড়াতাড়ি গাড়ী দেখিতে গেল। সেই অবসরে সুকুমার শুধু সহসা একবার ঘটককে কানে কানে বলিয়া দিল, হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের উনপঞ্চাশ নম্বর ঘরে একবার সন্ধ্যেবেলা দেখা করবে ঠাকুর!

ততক্ষণে সতীশ মোটর ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। সে দূর হইতে ইহাদের হাতছানি দিয়া ডাকিল। সুকুমার চলিতে চলিতে একটা টাকা পকেট হইতে বাহির করিয়া ঘটকের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া শুধু কহিল, গেলে আরও পাবে।

ঘটক পাকা লোক। সে বিস্মিত হইলেও বিস্ময় প্রকাশ করিল না। তেমনিভাবেই চুপি চুপি কহিল, কিচ্ছু ভাববেন না, উনপঞ্চাশ নম্বর আমার মনে থাক্‌বে।

হোস্টেলে পৌঁছিয়া সুকুমার সটান্ নিজের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। শারীরিক ক্লান্তিও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আসল কারণ সেটা নয়—প্রচণ্ড মানসিক চাঞ্চল্যই তাহাকে যেন অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মেয়ে সে অনেক দেখিয়াছে, মিশিয়াছেও অনেকের সহিত—টাকার জোর আছে বলিয়া বালিগঞ্জী মেয়ের বাপেরা ত দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন—কিন্তু এমনটি তাহার আর কখনও ঘটে নাই। কোন চমক লাগানো মেয়েই, না রূপে না বিদ্যাবুদ্ধিতে, কখনও এমনভাবে তাহার সমস্ত মনকে নাড়া দিতে পারে নাই। এ যেন কী এক রকমের আঘাত, যাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, হয়ত বা ভাল করিয়া তাহা বোঝাও যায় না, অথচ দেহমন অবসন্ন হইয়া পড়ে।

বহুক্ষণ সময় লাগিল তাহার আজিকার সমস্ত ঘটনাটা মনের মধ্যে ধারণা করিয়া লইতে। কী যে ঘটিল, তাহাই যেন মনে আসে না—শুধু

মনে পড়ে প্রচণ্ড একটা বিস্ময়, যাহার জন্য কোন আয়োজনই ছিল না মনের মধ্যে। অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে, যখন আর সমস্ত ঘরেই আলো জ্বলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা প্রায় রাত্রির দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে—তখন সে এক সময়ে মনে মনে সহসা স্থির করিয়া ফেলিল, ঐ মেয়েটিকে আমারই চাই, যেমন ক'রে হোক।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। বিছানা হইতে উঠিয়া কল-ঘরে গিয়া স্নান সারিয়া ফেলিল, তাহার পর যথারীতি প্রসাধনের পালা শেষ করিয়া ঘটকের আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। মিনিট-পনেরো পরেই ঘটক আসিয়া উপস্থিত; দারোয়ানকে বলাই ছিল, সে একেবারে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ঘরে পৌছাইয়া দিয়া গেল। ছাতা ও লাঠিটা এক কোণে রাখিয়া সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া ঘটক একটা চেয়ারে বসিল, তাহার পর একান্ত আত্মীয়ের মত প্রশ্ন করিল, রোদ্দুরে ঘুরে বাবুর শরীর কিছু খারাপ টারাপ হয়নি ত?

সুকুমার মাথা নাড়িয়া কহিল, না সে-সব কিছু নয়, তোমার সঙ্গে অন্য কথা আছে।

ঘটক সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া বসিয়া কহিল, ব্যাপারটা কী? বলুন দেখি!

একটু ইতস্তত করিয়া সুকুমার সোজাসুজিই কথাটা পাড়িল। কহিল, ওদের যা সব শুনলুম, আমাদেরও পাল্‌টি ঘর। তোমাকে এই বিয়েটি ভেঙ্গে ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।

ঘটক বোধ হয় এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে কিছুক্ষণ নির্বাক অবস্থায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একবার তাহার এমনও সন্দেহ হইল যে সুকুমার বোধ হয় পরিহাস করিতেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া যখন পরিহাসের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া

গেল না, তখন সে ঢোঁক গিলিয়া কহিল, তা আর কী ক'রে হয় বাবু, সতীশবাবুরও খুব পছন্দ, ওদের সঙ্গে সব বলা-কওয়া ঠিক—এখন কি আর কথা পাল্‌টানো যায়?

বোঝা গেল যে, এ উত্তরের জন্যও সুকুমার প্রস্তুতই ছিল। সে পকেট হইতে খান-পাঁচেক দশ টাকার নোট বাহির করিয়া কহিল, কী ক'রে হয় তা আমি জানি না, তবে যদি ক'রে দিতে পারো ত এখন এই—পরে আরও দু' শ' টাকা।

এই অকাট্য যুক্তিতে ঘটক বিচলিত হইল। সে নোট-কয়খানি ভাঁজ করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে কহিল, বলছেন যখন, তখন যেমন্ ক'রেই হোক্ ক'রে দিতে হবে। তবে কাজটা ভাল নয়, বড় নোংরা কাজ। এতে ক'রে আচার্য্যিদের বড় বদনাম হয়।······যাহোক —দেবেন খুশী ক'রে—এই কথা।

ইহার পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। প্রবীণ কুলাচার্য্য এমন সুকৌশলে কয়েকটি মিথ্যা কথা ব্যবহার করিলেন যে, সতীশের সহিত সম্বন্ধটা অবিলম্বে কাঁচিয়া গেল এবং সেই সঙ্গেই সুকুমারের সহিত সেটা পাকিয়া উঠিল। সুকুমার শ্বশুরের নিকট হইতে একটি পয়সাও লইল না, বরং খান-দুই অবশ্য প্রয়োজনীয় অলঙ্কার ও ঘর-খরচা বাবদ তাঁহার হাতে শ-পাঁচেক টাকা ধরিয়া দিল। এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে পাত্রীপক্ষ আনন্দে দিশাহারা হইয়া উঠিলেন, পাত্রবদল লইয়া কোন কথাই উঠিল না। আর বেচারী সতীশ! সে মনের দুঃখে দুই-একদিন পরেই দার্জিলিং চলিয়া গেল এবং সেইখান হইতেই বিহারের কোন্ এক শহরে একটা চাকরী জোগাড় করিয়া লইল, কলিকাতাতে আর ফিরিলই না।

সুকুমারের বাবা প্রবোধবাবুও ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতেন না। সে নিজেই বিবাহের দিন স্থির করিয়া ঠিক আগের দিন এক দীর্ঘ চিঠি

লিখিল এবং চার পাঁচজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও একজন ঠিকা পুরোহিত সঙ্গে করিয়া বিবাহ করিতে গেল।

প্রবোধবাবু চিঠিখানা পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রথমটা তাঁহার বিশ্বাসই হইল না, তাহার পর রাগে ও অপমানে জ্বলিয়া উঠিলেন। আত্মীয়-পরিজনরাও ছি-ছি করিয়া উঠিল, চারিদিকে ধিক্কারের একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এ ধারেও আর দিন নাই। বিবাহ ত আজ হইয়াই গেল, কাল সে সস্ত্রীক আসিয়া পড়িবে। বাধা দিবার সময় হিসাব করিয়াই সুকুমার চিঠি দিয়াছিল, সুতরাং সে উপায় আর নাই। এখন হয় বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতে হইবে, নয়ত সস্ত্রীক ছেলেকে সেই মুখেই বিদায় দিতে হইবে।

প্রবোধবাবু অবশ্য প্রথম রাগের ঝোঁকে সেই প্রস্তাবই করিয়াছিলেন, কিন্তু স্নানের জল ও গৃহিণীর চোখের জল অনেক খরচ হইবার পর মাথা ঠাণ্ডা হইল। ভাবিয়া দেখিলেন যে, বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুশ্রী ছেলে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অনেকদিন হইতে অনেক আশাই গড়িয়া তুলিয়াছেন—আজ তাহাকে চিরকালের মত বিদায় দেওয়া অসম্ভব। বিশেষ, সে যখন অজাত-কুজাতে বিবাহ করে নাই, তখন চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিয়া লাভ নাই; তাহাতে নিজেদের কেলেঙ্কারটাই বাহিরে বড় হইয়া উঠিবে।

অতএব একটা ঢোঁক গিলিয়া অপমানটা গলাধঃকরণ করিলেন, এবং সরকারকে ডাকিয়া উৎসবের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন।

চারিদিকে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। গরীবের ঘরের মেয়ে, হয়ত নিরাভরণ অবস্থাতেই আসিবে, সুতরাং একজন লোক টাকা লইয়া কলিকাতাতে চলিয়া গেল, কাল সকালে গহনা কিনিয়া স্টেশনেই বর-বধূর সহিত দেখা করিবে। প্রজাদের কাছে মান বাঁচানো চাই ত! এ ধারে জেলে-গোয়ালা-তাঁতী মহলে লোক আনাগোনা করিতে লাগিল,

কয়েকজন লোক যে ক'খানা সম্ভব মোটর সংগ্রহ করিয়া ছুটিল আত্মীয় কুটুম্বদের লইয়া আসিতে, দরকারী অদরকারী বহু জিনিস স্তূপীকৃত হইল —এক কথায় প্রচুর অর্থব্যয় করিবার পর ব্যাপারটা কোনমতে চলনসই হইয়া উঠিল।

বরবধূ আসিবার সময়-নাগাদ উৎসবের আয়োজনটা সম্পূর্ণ হইয়া আসিল বটে, ধিক্কারের সুরটা বাড়ি হইতে তখনও কিন্তু যায় নাই। কর্তা ট্রেণের সময় দেখিয়া গম্ভীর মুখে উপরে উঠিয়া গেলেন, গৃহিণী বরণের আয়োজনের ফাঁকে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন, প্রবীণদের চোখে চোখে তিরস্কারের ভাষা ফুটিয়া উঠিল, এমন কি তরুণরাও ব্যাপারটা অনুমোদন করিল না, নানারূপ কদর্য্য ইঙ্গিত করিয়া প্রকাশ্যেই ফিস্‌ফাস্ করিতে লাগিল।

এমনিই একটা আব্‌হাওয়ার মধ্যে বরবধূ আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু ইন্দিরা পাল্কী হইতে নামিয়া দুধে-আল্‌তায় দাঁড়াইতে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দৃষ্টি হইতে ধীরে ধীরে সে ধিক্কার মুছিয়া গেল, সে জায়গায় ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়। সকলেই নির্বাক—এমন কি বরণের কাজও সকলে যেন ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিতে সুকুমারের ছোট বোন সরমা ছুটিতে ছুটিতে প্রবোধবাবুর ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া কহিল, বাবা, বাবা, শীগ্‌গির নীচে নেমে আসুন, দাদা পরী বিয়ে ক'রে এনেছে—

সে ভুলিয়াই গিয়াছিল যে প্রবোধবাবু এই বেয়াদবীতে রাগ করিতে পারেন। প্রবোধবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে—তুই নীচে যা!

তবু কৌতূহলও সংবরণ করিতে পারিলেন না। শেষ পর্য্যন্ত নীচে নামিয়া আসিলেন এবং বরবধূ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি সুকুমারকে একেবারে ছেলেমানুষের মত বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,

আগে বললি না কেন, পাজী হতভাগা! এ দেখার পরও কি আমি আপত্তি করতুম? মিছিমিছি বদনাম কিন্‌লি, আমার মাথাটাও হেঁট হ'ল।

সুকুমার নিশ্চিন্ত হইল। ইহার পর উৎসব আর কোথাও বাধা পাইল না, এমন কি সুকুমারের এক বিলাতফেরৎ কাকা মনে মনে পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিও তাহা ভুলিয়া গিয়া তাহার সহিত নানারকম প্রগল্‌ভ রসিকতা শুরু করিয়া দিলেন।

৩

তাহার পর হাস্য-পরিহাস, গান-বাজনা, উৎসব ও ভোজনের মধ্য দিয়া কী করিয়া যে দুইটা দিন কাটিয়া গেল, তাহা সুকুমার টেরও পাইল না, অবশেষে এক সময়ে দেখিল মানবজীবনের দুর্লভতম মুহূর্তটি তাহার সম্মুখে উপস্থিত, যে মুহূর্তটির জন্য সে গত দুই সপ্তাহ প্রতিক্ষণ স্বপ্ন দেখিয়াছে—তাহার ফুলশয্যা!

সুকুমারের বুক কাঁপিতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত সে আশা করিতে পারে নাই যে ইন্দিরাকে সে সত্যই পাইবে—এমন একান্তভাবেই সে তাহাকে চাহিয়াছিল! অত্যুগ্র কামনার সে ভয় এখনও যায় নাই, এখনও যেন বিশ্বাসই হয় না ইন্দিরা তাহার স্ত্রী হইয়াছে, সে এখন সম্পূর্ণরূপে তাহারই।

ফুলশয্যার অনুষ্ঠান চলিয়াছে ধীরভাবে, কাহারও কোন তাড়া নাই। অকারণ উচ্ছল হাসিতে সবাই ভরপুর, আজিকার দিনে সকলে দেখাইতে চায় নিজেকেও, তাই হাস্য-পরিহাসে কাজ চলে মন্থরগতিতে। সুকুমার ইহারই ফাঁকে একবার ইন্দিরাকে দেখিয়া লইল। পল্লীগ্রামে যে রূপ

দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, এ রূপ তাহার চেয়ে সহস্র গুণে উজ্জ্বল। সভ্যতার ঘষামাজা ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তাহাকে সাক্ষাৎ-ইন্দিরার মতই দেখাইতেছিল, ইহাকে যেন স্পর্শ করিতেও ভয় করে। অযত্ন ও দারিদ্র্যের মধ্যে রূপ ঢাকে নাই সত্য কথা, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত ছিল যেন, আজ সে ভস্মের আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিলে নিজেরই দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে।

শুধু তাই নয়—এই দুইদিনেই সে এ বাড়ির সকলকে বশ করিয়া ফেলিয়াছে। ছোট ছোট ভাই-বোনেরা ত আহার-নিদ্রা ভুলিয়াছে, তাহারা একটি মিনিটও বৌদিদিকে ছাড়িতে চায় না—খাস শাশুড়ী পর্য্যন্ত মুগ্ধ, তিনি এই গোলমালের মধ্যেও চুপি চুপি সুকুমারকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, এধারে বলছিস্ গরীবের ঘরের মেয়ে, লেখাপড়াও দেখলুম প্রায় কিছুই জানে না—এমন সব সহবৎ কোথা থেকে শিখলে বল্ দেখি? আর কী মিষ্টি কথাবার্তাই বা বাছার, যেন একটি দণ্ড চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা করে না।

অর্থাৎ, সুকুমারের সুখের পাত্র কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিতরূপে সকলের কাছেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, এ বিবাহে সে ভুল করে নাই। এখন শুধু এই সৌভাগ্যটা নিশ্চিতভাবে উপভোগ করার অপেক্ষা!···সে একবার অধীরভাবে ঘড়িটার দিকে তাকাইল। তাহার দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া খুড়িমা তাড়া লাগাইলেন, ওলো ছুঁড়িরা, তোদের হ'ল না এখনও? সারারাত এমনি করে কাটাবি নাকি?

অপাঙ্গে বিদ্যুৎ হানিয়া একটি তরুণী জবাব দিল, বাবা বাবা! যাচ্ছি গো, যাচ্ছি! ছেলের আর তর সয়না।...তোমার ত সারা জীবনই রইল ভাই ঠাকুরপো, এই তিনটে মিনিট আমরা আছি, তাই সইছে না?··· নে রে তোরা, সব চট্‌পট ক'রে সেরে নে—

কাজও আর বেশী ছিল না। একটু পরেই সকলে বাহির হইয়া গেল।

সুকুমার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটায় খিল লাগাইয়া আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার পর আপন মনেই কহিল, একটা বাঁচোয়া, এদিক দিয়ে কেউ আড়ি পাততে পারবে না।···যা দলটি, বাব্বা, দেখলেই ভয় করে—

কিন্তু আড়ে একবার ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে তেম্‌নি নতমুখে খাটের এক পাশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। দৃষ্টি তাহার দূরে বাতিদানের উপর আবদ্ধ; সমস্ত দেহ যেন পাথরের মত কঠিন ও নিশ্চল, এমনি কি মুখও। প্রথম অনুরাগ, আশা ও আশঙ্কার সে আবেশটি কোথায় গেল—লজ্জা ও সুখের সেই অপূর্ব লালিমা?

কেমন যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় সুকুমারের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে মিনিট-খানেক ইতস্তত করিয়া নিজের চাদর ও ফুলের মালাটা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, তাহার পর কাছে গিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, তোমার ঐ ফুলের গহনাগুলো খুলে দিই, কি বলো?··· ওগুলো প'রে বড় আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়!

স্ত্রীকে প্রথম সম্ভাষণের মত আর কোন কথাই সে যেন খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু ইন্দিরাও ত প্রথম নিভৃতে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অকারণে লাল হইয়া উঠিল না! এমন কি সে লজ্জাতে আর একটু ঘাড়ও নামাইল না, তেমনি ভাবলেশহীন মুখেই একটি একটি করিয়া ফুলের গহনাগুলি খুলিতে লাগিল। সুকুমার নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, সে আশা করিতেছিল যে, হয়ত সবগুলি ইন্দিরা খুলিতে পারিবে না, সলজ্জভাবে তাহার শরণাপন্ন হইবে, কিন্তু সে সব কিছুই হইল না, ইন্দিরা নিজেই সবগুলি খুলিয়া ফেলিল।

আরও কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। সে মুখে কঠোর কিছু নাই সত্য কথা, কিন্তু সেদিকে চাহিলে মনে মনে ভরসাও পাওয়া যায় না। একটু পরে কোন মতে সাহস সঞ্চয় করিয়া সুকুমার ইন্দিরার একখানি কোমল

উষ্ণ হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, তুমি অমন ক'রে রয়েছ কেন ইন্দু, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি?

ইন্দিরা জবাব দিল না। একটু পরে সুকুমার আবারও কহিল, বলো, লক্ষ্মীটি, জবাব দাও—

এবার ইন্দিরা কথা কহিল। তেমনি ভাবে দূরের বাতিদানটার দিকে চাহিয়াই অতি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, ও কথা শুনে এখন কি কিছু লাভ আছে?

সুকুমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজ পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ের নিকট হইতে সে এমন সম্ভাষণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না বোধ হয়। সে বিহ্বল কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করিল, তার মানে?

এইবার ইন্দিরার ওষ্ঠপ্রান্তে সামান্য একটু হাসির আভাস দেখা গেল। কিন্তু সে কৌতুকের কিংবা বিদ্রূপের—তাহা বোঝা গেল না। মুক্তার মত দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া সে যেন হাসিটা সামলাইয়া লইয়া জবাব দিল, বিয়ে ত হয়েই গেছে, সেটা ত আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না, তখন আর ওসব জেনে লাভ কি?

সুকুমার নিতান্ত গতানুগতিকভাবেই পছন্দ হওয়ার প্রশ্নটা করিয়াছিল, তাহার উত্তরে ইন্দিরা লজ্জিত নতমুখে, মধুর হাস্যে সম্মতি জানাইবে এই ছিল তাহার আশা। অকস্মাৎ যে ও পক্ষ হইতে এমন প্রশ্ন উঠিবে, তাহা সে ধারণাও করিতে পারে নাই। ইহার পিছনে কত কী অর্থ থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কহিল, সে উপায় থাকলে কি তুমি এ বিয়ে ফিরিয়ে নিতে?

ছোট্ট একটা হাই তুলিয়া ইন্দিরা তেমনি মৃদু কণ্ঠেই জবাব দিল, কে জানে, ও কথা ত ভেবে দেখিনি। আর তা ছাড়া দরকারই বা কি ভাববার?

এ যেন কোথা হইতে কী হইয়া গেল। একটু আগেই মনে

হইতেছিল যে, অমৃতের পাত্র বুঝি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, এখন যেন সমস্তটা কেমন বিস্বাদ, বিষাক্ত হইয়া উঠিল। হয়ত ইহার সমস্তটাই পরিহাস—ইচ্ছা করিয়া, মজা দেখিবার জন্যই সে এমন বাঁকা কথা কহিতেছে—কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় কই? অস্বস্তি মনে থাকিয়াই যায়।

দু'জনেই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। একটু পরে ইন্দিরা আস্তে আস্তে কহিল, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে, শোব আমি?

মুহূর্ত মধ্যে স্বকুমার সব ভুলিয়া গেল। অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কহিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইত, ইস্, বড্ড অন্যায় হচ্ছিল আমার। নাও, নাও, আর এক মিনিট দেরি নয়—শিগ্গির শুয়ে পড়ো।···যা কষ্ট গেল সারা দিন—

ইন্দিরা প্রশস্ত শুভ্র শয্যার এক পাশে কোনমতে সঙ্কুচিতভাবে শুইয়া পড়িতেছিল, স্বকুমার সস্নেহে তাহাকে জোর করিয়া সরাইয়া ভালভাবে শোয়াইয়া দিল। ইন্দিরা কোন প্রকার বাধা দিল না, কিন্তু মধুর সেই সলজ্জ বাধাটিই স্বকুমার আশা করিতেছিল বোধ হয়। যাহা হউক, সে সমস্ত রকম ক্ষোভকে মনের মধ্য হইতে দূর করিয়া নিজেও পাশে শুইয়া পড়িল এবং মাথার শিয়র হইতে একটা ফুলের পাখা তুলিয়া লইয়া ইন্দিরাকে বাতাস করিতে লাগিল। ইন্দিরা শুইয়াই চোখ বুজিয়াছিল, এখনও চোখ খুলিল না, কিন্তু হাত বাড়াইয়া পাখাখানা স্বকুমারের হাত হইতে কাড়িয়া লইল।

স্বকুমারের মনের মধ্যে যে আকুল প্রেম প্রকাশের পথ খুঁজিয়া মাথা কুটিতেছিল, সে আর বাধা মানিল না, এই সামান্য প্রশ্রয়টুকুতেই একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে অকস্মাৎ ইন্দিরাকে সবেগে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহার ওষ্ঠ, কপোল, কণ্ঠ ভরাইয়া দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রূঢ় সত্যে যেন তাহার চমক ভাঙিল, ওপক্ষ হইতে সাড়া মিলিতেছে কই? বাধা নাই বটে, কিন্তু আগ্রহও

নাই ত! সুখের আবেশে বিগলিত হওয়ার লক্ষণ কই?...এ যে নিতান্ত কাঠের পুতুল।

নিজের আবেগের জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া সুকুমার আবার শুইয়া পড়িল। তারপর কতকটা অনুশোচনার সুরেই বলিল, না, এইবার তুমি ঘুমোও, আর বিরক্ত করব না...যা ঝড় ব'য়ে গেল তোমার ওপর দিয়ে—

এ যেন ইন্দিরার হইয়াই কৈফিয়ৎ দেওয়া।

ইন্দিরা কথা কহিল না। তেমনিভাবেই চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে এক সময় বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল। কিন্তু সুকুমারের চোখে কিছুতেই ঘুম আসিল না। মনে মনে আশা ও আশঙ্কার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে খানিকটা পরে উঠিয়া ঘরে পায়চারী করিতে শুরু করিল। প্রায় আধঘণ্টাকাল পায়চারী করিবার পর খাটের পাশে টিপাইতে রাখা রূপার গ্লাস হইতে খানিকটা জল মুখে-চোখে দিয়া আবার আসিয়া শুইয়া পড়িল।

তবু চোখে তন্দ্রা নামিল না। বাতিদানে বাতির শিখাটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিঃশব্দে পুড়িতে লাগিল, খাটের ছত্রিতে ছত্রিতে বাঁধা গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুলগুলি নীরবে গন্ধ ছড়াইতে লাগিল; চারিদিকে আনন্দের সমস্ত উপকরণই প্রস্তুত অথচ তাহার কিছুই সুকুমারের কাজে আসিল না। বরং সবগুলি মিলিয়া যেন নীরবে তাহাকে পরিহাসই করিতে লাগিল। সে প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিল।

৪

ভোরের আলো জানলার খড়খড়িগুলি স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দিরা উঠিয়া পড়িল। খোঁপাটা ঠিক করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিতেই চোখ পড়িল তাহার নিদ্রিত সুকুমারের দিকে। ততক্ষণে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ সত্যই সুন্দর, ঘুমন্ত অবস্থাতে আরও সুন্দর

দেখাইবার কথা, কিন্তু দুশ্চিন্তার কালিমা ঘুমের মধ্যেও তাহাকে ছাড়ে নাই। প্রশস্ত সুন্দর ললাটে ভ্রূকুটি যেন এখনও লাগিয়া আছে। সেদিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কী মনে করিয়া ইন্দিরা একবার শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা ঠিক করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া সহসা মনে পড়িল পিসিমার উপদেশ—সকালে উঠে রোজ একবার ক'রে সোয়ামীকে পেন্নাম করবি, ওঁয়ারাই হলেন এ জন্মের দেবতা!

কিন্তু ঘুমন্ত মানুষকেই বা প্রণাম করা যায় কি করিয়া—অকল্যাণ হয় যে! সে একটু ইতস্তত করিয়া ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া ঘাড় নীচু করিয়া উদ্দেশে একটা নমস্কার করিল, তাহার পর বাতিদানের বাতি কয়টা নিভাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দিরা যখন নমস্কার করিতেছে ঠিক সেই সময়েই, সুকুমারের সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুমের ঘোরেও একটা অতৃপ্তি, একটা দুশ্চিন্তা লইয়াই সে চোখ মেলিয়াছিল, কিন্তু চোখ মেলিতে প্রণামরতা ইন্দিরার সুন্দর ভঙ্গীটি তাহার চোখে পড়িল। একসঙ্গে আনন্দ ও বিস্ময় তাহাকে ধাক্কা দিল। যাক্—তাহা হইলে ব্যাপারটা অত কিছু নয়। হয়ত কোন কারণে তাহার মনে কোন অভিমান হইয়াছিল কাল, কিংবা হয়ত মাথাধরাই—রাত্রিটা ঘুমাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সব চলিয়া গিয়াছে।...

মনের মেঘ কাটিয়া যাওয়া মাত্রই সুকুমার যেন আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিল। বার-কতক এপাশ ওপাশ করিয়া ইন্দিরার মাথার বালিশটার মধ্যে কিছুক্ষণ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, তাহাতে এখনও নববধূর কেশের সৌরভ লাগিয়া আছে—এ যেন একরকম ইন্দিরাকেই অনুভব করা। কিন্তু সে ভাবেও বেশীক্ষণ সে শুইয়া থাকিতে পারিল না, এক সময় সহসা উঠিয়া পড়িল। তখনও বাড়ীর অনেকে ঘুমাইতেছে,

কর্মক্লান্ত চাকররাও সকলে উঠে নাই। শুধু উঠিয়াছেন তাহার মা, অত সকালেই স্নান সারিয়া পূজার ঘরে ঢুকিয়াছেন। সারা বাড়ীটাতে চোখ বুলাইয়াও ইন্দিরাকে দেখা গেল না, অনুমান করিল, সে বোধ হয় স্নান করিতে গিয়াছে—সুকুমার তখন টুথ-ব্রাসটা লইয়া বাগানের দিকে বাহির হইয়া পড়িল।

ঝলমলে প্রভাত, মধুর হাওয়া—সমস্ত বিশ্বটাই মধুর আজ। অনেকক্ষণ যেন নেশার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন সকলেই উঠিয়া পড়িয়াছেন। মা ঠাকুরঘরের সামনের দালানে বসিয়াছিলেন, অনুযোগ করিয়া কহিলেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ খোকন? তিনবার চা করলুম, তিনবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

সে দিকে অবশ্য তাহার মন ছিল না। সে দেখিতেছিল স্নান সারিয়া চমৎকার একখানি শাড়ী পরিয়া আসিয়া ইন্দিরা বসিয়াছে তাহার মায়ের কাছে, শ্বশুরের জন্য ফল কাটিয়া নিপুণভাবে একটি সাদা পাথরের রেকাবীতে সাজাইতেছে। এ যেন এক অভিনব রূপ, দেখিলে আর চোখ ফেরানো যায় না! প্রবোধবাবুও সেখানে দাঁড়াইয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, এখন কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, এরি মধ্যে ওকে খাটাতে শুরু করেছ সব।

সুকুমারের মা ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, যা পাগ্‌লী বৌ তোমার, ও কিছুতেই চুপ ক'রে থাকবে না। সাফ্ ব'লে দিলে,—কাজ আমার চাই-ই, আমি এম্‌নি ব'সে থাকতে পারব না। যেমন কুড়ে খোকা, ঠিক তার উল্‌টোটি হয়েছে।

মা সস্নেহে সুকুমারের দিকে চাহিলেন। সুকুমার ঘাড় নীচু করিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে লাগিল, কথা কহিল না। তাহার মন তখন অপূর্ব এক সুরে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কথা কহিতে ভরসা হয় না—পাছে আনন্দ উপ্‌চাইয়া উঠে কণ্ঠস্বরে।

পুরুষ ও রমণী

সারাদিনেও তাহার সে সুর কাটিল না। বার বার নানা ছলে সে অন্তঃপুরের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর প্রতিবারই চোখে পড়ে ইন্দিরার নব নব মূর্তি। তাহার ভাইবোন, বাপ-মা, কাকা-কাকীমা সকলে মিলিয়া যেন সেই একটি মানুষকেই কেন্দ্র করিয়া উৎসবের সমারোহ শুরু করিয়াছেন। ছোটরা হুড়াহুড়ি করিতেছে, বড়রা সাজাইতেছেন। ইন্দিরাও যেন একেবারে এ বাড়ীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সকলের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের দিকে তাহার দৃষ্টি। দুপুর বেলা প্রবোধবাবু জোর করিয়া তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইলেন। মা একবার সজল নেত্রে আসিয়া বলিয়া গেলেন, কী শান্তিই যে দিলি বাবা! এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

আনন্দে ও গর্বে সুকুমারের বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। এ তাহারই বিজয়গর্ব। বোঝা গেল যে পাকা জহুরীর দৃষ্টি তাহার আছে। কোথাও সে বিন্দুমাত্র ভুল করে নাই।······

সারাদিন সে যেন দক্ষিণবাতাসে উড়িয়া বেড়াইল। মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাঁর আনন্দের ভাণ্ডার আজ তাহারই জন্য বিশেষভাবে সাজাইয়া বসিয়া আছেন—শুধু দয়া করিয়া গ্রহণ করার অপেক্ষা। সমস্তক্ষণ সে একাগ্রমনে অপেক্ষা করিতে লাগিল রাত্রির জন্য, আজ আর সে কোন বাধা মানিবে না, ইন্দিরাকে একান্তভাবে বুকের মধ্যে পাইতেই হইবে।···কেমন করিয়া সে আজ তাহার বধুর সহিত প্রণয় সম্ভাষণ করিবে, মনে মনে তাহারও একটা মহড়া দিয়া রাখিল।

কিন্তু রাত্রে অবশেষে যখন তাহার অধীর প্রতীক্ষার সত্যই অবসান হইল, ইন্দিরা তাহারই জলের গ্লাস হাতে করিয়া প্রবেশ করিল, তখন তাহার সে আনন্দময়ী মূর্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আবার সেই ভাব-লেশহীন মর্মর প্রতিমার মত মুখ। তাহার সৌন্দর্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু ভিতরের প্রাণটি যেন বিদায় লইয়াছে।

তবু, ইন্দিরা যখন জলের গ্লাসটি টিপাইয়ের উপর রাখিয়া খাটের একেবারে এক কোণে গিয়া বসিল, তখন সে সমস্ত দ্বিধা- সমস্ত আশঙ্কা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া কাছে বসাইল এবং সবেগে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, অত দূরে কেন ইন্দু, তোমার স্থান কোথায় জানো না ?

ইন্দিরা কোন বাধা দিল না, কিন্তু কথাও কহিল না। তেমনি অবিচলিত মুখে মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল। এই নিঃশব্দ প্রত্যাখানের অপমান চাবুকের মতই সুকুমারের বুকে আঘাত করিল, কিন্তু তবু সে ধৈর্য হারাইল না, জোর করিয়া ইন্দিরার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, তুমি কাল থেকে অমন ক'রে আছ কেন রাণী ? একটি বার ভাল ক'রে আমার দিকে চাও দিকি! আমাকে কি তোমার ভালো লাগে না ?

তবু ইন্দিরা জবাব দিল না।

তখন যেন একটু অধীরভাবেই সুকুমার কহিল, তুমি কি এমনি চুপ ক'রেই থাকবে ? আমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছে, তা একবারও ভাবছ না। মুখ তোল লক্ষ্মীটি, জবাব দাও!

এবার ইন্দিরা মুখ তুলিল। তাহার আয়ত চক্ষুর প্রশান্ত স্থির দৃষ্টি সুকুমারের মুখের উপর রাখিয়া কহিল, কিসের জবাব দেব বলো।

সুকুমার যেন এ সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, ঐ ত বল্লুম, তুমি অমন পাথরের মত হয়ে যাচ্ছ কেন আমার সামনে, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি ?

ইন্দিরা ধীরকণ্ঠে বেশ স্পষ্টভাবেই জবাব দিল, সে ত কালই বলনুম তোমাকে যে, আমি ও কথা ভেবে দেখিনি, ভাববার দরকারও নেই।

সুকুমার ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমার যে ওটা জানা দরকার।

ইন্দিরা পুনশ্চ মুখ তুলিয়া কহিল, কেন ?

কেন? তার মানে?

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দিরা জবাব দিল, পছন্দ অপছন্দর কথাটা আগেই ওঠে জানি। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে কি না সেটা বিয়ের আগে জিজ্ঞাসা করলে বরং তার মানে বুঝতে পারতুম, এখন আর ও কথায় লাভ কি?

সুকুমার কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর তিক্তকণ্ঠে কহিল, লাভ নেই, তার মানে অপছন্দ হ'লেও বিয়ে আর ফিরবে না, এই ত? সেটা ফেরানো সম্ভব হ'লে কি ফিরিয়ে নিতে? সেইটেই আমি জানতে চাইছি—

ইন্দিরা কহিল, ওসব কথা আমাদের শুনতে নেই। বিয়ে কোন দিনই কারুর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না······আর তা ছাড়া আমার পছন্দ অপছন্দর আছেই বা কি! তুমি জমিদারের ছেলে, বড়লোক, তোমার কাছে ভাল থাকব জেনেই ত বাবা তোমার হাতে দিয়েছেন, আমি কি আর তাঁর চেয়ে বেশী বুঝি?

সুকুমার মুহূর্ত-কয়েক বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ও, আমি বড়লোকের ছেলে, এই আমার অপরাধ। কিন্তু বড়লোকরা কি মানুষ নয়?

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মিছিমিছি ও কথা কেন তুলছ! আমি ত তা বলিনি।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুকুমার কহিল, না, সোজা ক'রে বলোনি, তবে ঘুরিয়ে বলেছ।······তাহ'লে কি বুঝব বড়লোকের ঘরে এসে তোমার বড্ডই কষ্ট হচ্ছে? এ ঘরে না এলে কোথায় গিয়ে পড়তে হ'তো তা কোনদিন ভেবে দেখেছ কি? তোমাদের ঐ পাড়াগাঁয়ের হয়ত কোন তাড়িখোর বিড়িওয়ালার হাতে পড়ে দু'বেলা মার খেতে হ'ত।

ইন্দিরা কিন্তু এ আঘাতে বিচলিত হইল না, বরং বেশ সহজ-

শান্তকণ্ঠে কহিল, সে জানি। তুমি অনেক দয়া করেছ, এ আমরা সকলেই জানি। পাছে তোমার গরীব বন্ধুর হাতে পড়লেও আমার কষ্ট হয়, সেই ভয়ে যে তুমি অনেক কষ্ট ক'রে সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছ তাও জানি!

সহসা যেন সুকুমার ছিট্‌কাইয়া উঠিল। ইন্দিরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে দাঁত দিয়া কহিল, ও, এতক্ষণে বোঝা গেল যে দরদটা কোথায়!......তাই এত রাগ আমার ওপর!......একথা আগে বলোনি কেন যে সতীশকে তুমি ভালোবাসো, তাহ'লে আমি যেমন ক'রেই হোক্ সে ব্যবস্থা ক'রে দিতুম।

ইন্দিরার দুই চক্ষু সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে একটা কি কঠিন জবাব দিতে গিয়াও চাপিয়া গেল। তাহার ঠোঁট-দুইটি অব্যক্ত উত্তরে মুহূর্ত্-দুই থর থর করিয়া কাঁপিয়া চুপ করিল। তাহার পর সে সংযতকণ্ঠেই কহিল, এ যে কত বড়ো মিথ্যাকথা তা ত তুমিই ভাল জানো!

সুকুমার কহিল, মিথ্যে কথা?

ইন্দিরা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা। তুমি আর তোমার বন্ধু যে একসঙ্গেই দেখতে গিয়েছিলে তা ভুলে যাচ্ছ কেন! তা ছাড়া তখন আমি কাউকেই দেখিনি, দেখবার মত অবস্থাও আমার ছিল না। আমার কাছে তখন, তুমি, তিনি বা অন্য যে কেউ সমান!

সুকুমার তখন যেন কতকটা অসংলগ্নভাবেই কহিল—তবে, তবে তুমি অমন করছ কেন?

স্থিরদৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর মেলিয়া ধরিয়া ইন্দিরা জবাব দিল—কি করেছি আমি? আমি কি কোন রকমে তোমার অবাধ্য হয়েছি?

উত্তেজিতভাবে সুকুমার কহিল, অবাধ্য! কিন্তু বাধ্যবাধকতাই কি সব? স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী কি খালি ঐটুকুই আশা করে?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দিরা কহিল, কি জানি, আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সব কথা বুঝতে পারি না। কি করলে তুমি খুশী হও বলো, তাই করব!

সুকুমার আরও জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, তুমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া জানো না, সরল—এই কথাই ঘটক বলেছিল বটে, কিন্তু এখন দেখছি সে মিছে কথা বলেছিল! শহরের দশটা পাশকরা মেয়ে এলেও তোমার মনের তল পাবে না!···উঃ, কি সাংঘাতিক!

সে উত্তেজিতভাবে পায়চারী করিতে লাগিল। খানিকটা পরে সহসা আবার ইন্দিরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া যেন কৈফিয়তের সুরেই বলিল, দুজনে একসঙ্গে দেখতে গিয়েছিলুম! তেমন আরও কেউ যেতে পারত, এর আগেও ত কত লোক দেখতে গেছে। তোমার বাবা পছন্দ করলেন আমাকেই, তা আমি কি বলব! আমি ত এমনিও দেখতে যেতে পারতুম—এতে এমন কী গুরুতর অপরাধ হয়েছে?

ইন্দিরা চুপ করিয়া রহিল।

সুকুমার বোধ হয় উত্তরের আশাতেই খানিকটা নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিল, যাক্—সে যা হবার তা' হয়েছে; এখন বলো আমি কি করতে পারি। কি করলে তুমি সুখী হও বলো—আমি সেই ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি!

ইন্দিরা এবার জবাব দিল, নীচের দিকে চাহিয়াই কহিল, আমি না বুঝে কি ব'লে ফেলেছি, তুমি আমায় মাপ করো—

সুকুমার বিস্মিত হইয়া চাহিল। কহিল, তুমি ঠাট্টা করছ আমাকে?

ইন্দিরা কহিল, সত্যিই আমি মাপ চাইছি। আমি অত ভেবে কিছু বলিনি—

সুকুমার এইটাই বিশ্বাস করতে চায়। সে সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল। নিজের উত্তেজনার জন্য একটু লজ্জিতও হইল। আরও বার-দুই ঘরের মেঝেতে পায়চারী করিয়া এক নিশ্বাসে জলের গ্লাসটা

শেষ করিল, তাহার পর খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, তুমিও আমাকে মাপ করো ইন্দু, মনের দুঃখে অনেক কটুকথা বলেছি তোমাকে! …কিন্তু এত আরাধনার পর তোমাকে কাছে পেয়েও না পাবার যে কি দুঃখ তা যদি তুমি বুঝতে!…

ইন্দিরা স্বামীর দিকে ফিরিয়া বসিয়া কহিল, কাল রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হয়নি, আজও সারাদিন ঘুমোওনি। তুমি এইবার শুয়ে পড়ো, আমি বরং বাতাস করছি—

এত দুঃখের পর এই মিষ্ট কথাতে যেন সুকুমারের চোখে জল আসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ সুবোধ বালকের মত শুইয়া পড়িয়া কহিল, তুমিও আমার কাছে এস তা'হলে রাণী, একেবারে আমার বুকের কাছে—

ইন্দিরা কাছে সরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সে শুইল না। মাথার শিয়র হইতে পাখাটা তুলিয়া সুকুমারকে বাতাস করিতে লাগিল। সুকুমার কিছুক্ষণ চোখ বুঝিয়া প্রিয়তমার হাতের এই মধুর সেবাটুকু উপভোগ করিল, তাহার পর মনের আবেগ আর সামলাইতে না পারিয়া ইন্দিরাকে একেবারে টানিয়া লইল নিজের বুকের উপরে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল যেন ইন্দিরা আবার সেই আগের মত পাথর হইয়া গেল, সে স্বামীর উচ্ছ্বাসে কোনরূপ বাধা দিল না বটে, কিন্তু মনে হইল যেন সুকুমারের প্রেমের এই উদ্দাম প্রকাশে সে অপমানিত বোধ করিতেছে।

সুকুমার তাহাকে আস্তে আস্তে মুক্ত করিয়া অতি সন্তর্পণে পাশে শোয়াইয়া দিল, তাহার পর ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমারই ভুল ইন্দু, আমি একদিনেই ভালবাসা পেতে চাই।...আমরা যেমন একদিনেই ভালবাসতে পারি, তোমরা তা পারো না—এইটেই ভুলে গিয়েছিলুম!…না, তুমি ঘুমোও, তোমাকে আর বিরক্ত করব না—

কিন্তু তাহার এ করুণ আবেদনও ব্যর্থ হইল। ইন্দিরা কোন উত্তর দিল না।

৮

তাহার পর হইতে এ অভিনয় প্রত্যহই চলিতে লাগিল। সুকুমার দূর হইতে লক্ষ্য করে যে, তাহাকে বাদ দিয়া সমস্ত সংসারটাই ইন্দিরার প্রাণের স্পর্শে যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই তাহার অন্তরের মাধুর্য ও বাহিরের দাক্ষিণ্য এবং সেবায় কৃতার্থ হইতেছে, কেবল এ সমস্তর উপরে যাহার অধিকার ও দাবী সকলের চেয়ে বেশী সেই ব্যক্তিটিই দিনের পর দিন বঞ্চিত হইতেছে। শ্বশুরগৃহের সকলেই ইন্দিরার আত্মীয়, খালি যে লোকটিকে উপলক্ষ্য করিয়া এ আত্মীয়তার সূত্রপাত সেই স্বামীই তাহার রহিয়া গেল বহু দূরে—কিছুতেই, কোনমতেই সে সেই কঠিন ব্যবধান দূর করিতে পারিল না।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর সেবায় তাহার ত্রুটি নাই। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত তাহার প্রত্যেকটি প্রয়োজনের দ্রব্য ঠিক যন্ত্রের মত হাতের কাছে আগাইয়া দেয়। তাহার সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ইন্দিরার প্রখর দৃষ্টি। সেই সেবার জন্য যেটুকু কথা বলা প্রয়োজন তাও সে অত্যন্ত সহজভাবেই বলে, কোথাও সঙ্কোচ বোধ করে না। অথচ সেইটাই যেন সুকুমারের আরও অসহ্য বোধ হয়। প্রথম দিককার বিক্ষোভ তাহার আর নাই, সে উগ্রতা কমিয়াছে, তাই ভালবাসার দৃষ্টি এখন আরও অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ইন্দিরা গুরুজনের উপদেশ ভোলে নাই, স্বামীর প্রতি সমস্ত কর্তব্যই তাহার জানা আছে এবং সবগুলিই সে নির্ভুলভাবে পালন করে। কিন্তু যতবারই সেই কর্তব্যকে প্রেম বলিয়া সুকুমার ভুল করিয়াছে, ততবারই ইন্দিরার হৃদয়ের শীতল বর্মে প্রতিহত হইয়া

তাহাকে লজ্জিত হইতে হইয়াছে। স্ত্রীর অন্তরলোকে তাহার কোন অধিকার নাই—এই কথাটাই শুধু বারবার নূতন করিয়া বুঝিয়াছে।

কিন্তু কেন?

এ প্রশ্নের কোন উত্তরই সুকুমার পায় না। ইন্দিরা এ বিষয়ে একেবারে নীরব। তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, আঘাত করিয়া কোন রকমেই কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। শুধু সে প্রশ্ন করে, আমার কি কোন অপরাধ হচ্ছে? কী করতে হবে বলো—

এক এক সময়ে সুকুমার যেন ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আবার কলিকাতায় চলিয়া যাইবে, পড়াশুনায় মন দিবে, কিন্তু সে সময় যখন সত্যই কাছে আসে তখন আর যাইতে পারে না। এই মেয়েটি যেন তাহাকে জাদু করিয়াছে; প্রতিনিয়ত কী এক অমোঘ আকর্ষণে টানে, অথচ কাছে গেলে কঠিন প্রত্যাখ্যানে ফিরাইয়া দেয়!

এক এক সময় সুকুমার ভাবে যে, এ বোধ হয় সতীশেরই অভিশাপ। তাহাকে আশার ধন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে বলিয়াই, বোধ হয়, সুকুমার এমন করিয়া তাহার শতজন্মের সাধনার ধনকে কাছে পাইয়াও পাইতেছে না। অমৃতের পাত্র চোখের সামনে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, অথচ পিপাসা মিটাইবার কোন উপায় নাই।—

সুকুমারের মাও কিছুদিন পরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিলেন। একদিন একান্তে বধূকে কাছে ডাকিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বৌমা, ঠিক ঠিক জবাব দেবে।

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িল। তাহার ভাবে বোধ হইল, প্রশ্নটা সে অনুমানই করিয়াছে।

সুকুমারের মা কহিলেন, আমি কিছুদিন ধ'রেই লক্ষ্য করছি খোকার মনে সুখ নেই! তোমার মত লক্ষ্মীকে পেয়েও সে অসুখী কেন মা?

ইন্দিরা জবাব দিল না, বরং ঘাড় আরও নীচু করিল।

একটু পরে শ্বাশুড়ী কহিলেন, চুপ ক'রে থেকোনা মা, আমার মায়ের প্রাণ, বোঝো ত? ও আমার বড় আদরের প্রথম সন্তান, ওর শুক্‌নো মুখ দেখলে বড্ড কষ্ট হয়।

ইন্দিরা নতমুখেই ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আমি ত জেনে শুনে কোন ত্রুটিই করি না মা।

হরিপ্রিয়া সস্নেহে কহিলেন, তা' জানি মা।...কিন্তু তবু কেন অমন ক'রে বেড়ায় ও?...আমার কাছে লজ্জা ক'রোনা বৌমা, ঠিক ক'রে বলো দেখি, তুমি কি ওকে ভালবাসতে পারো নি?

ইন্দিরা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু উনিও ত আমাকে ভালোবাসেন নি!

বিস্মিত হইয়া হরিপ্রিয়া কহিলেন, সে কি বৌমা। তুমি তা'হলে ওর দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দ্যাখোনি।...তুমি বড্ড ভুল করেছ মা। ও যে তোমাময় হয়ে আছে—

ইন্দিরা ধীরে ধীরে কহিল, আমাদের গাঁয়ের জমিদার হরেন বাবুকেও আমি চোখে দেখেছি মা। খুব সুন্দরী বৌ তাঁর, নিজে দেখে পছন্দ ক'রে এনেছিলেন। প্রথম প্রথম তিনিও একটি মিনিট তাকে না দেখে থাকতে পারতেন না। তারপর এক বছর যেতেই যেমন নেশা কেটে গেল, তিনি অমনি কলকাতায় চলে গেলেন। শুনেছি সেখানে তাঁর বাইজী আছে। আর তাঁর সেই বৌয়ের সোণা-দানার মধ্যে থেকেও চোখের জল শুকোয় না।...তাই আমার বড্ড ভয় করে—

হরিপ্রিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি লেখা-পড়া কতদূর শিখেছ বৌমা?

ইন্দিরা লাল হইয়া উঠিল। কহিল, আমার বাবা বড্ড গরীব জানেন ত মা, ভিখারী বললেই হয়, বই কোথায় পাব? এম্নি, আমার এক বৌদির কাছে কিছু কিছু অক্ষর পরিচয় হয়েছিল, তারপর ঐ হরেনবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকেই দু'একখানা বই এনে পড়বার চেষ্টা করেছিলুম—

হরিপ্রিয়া কহিলেন, তোমার কথাবার্তা চাল-চলন সবই কিন্তু লেখাপড়া জানা মেয়ের মতই!···আশ্চর্য্য!···সব চেয়ে দুঃখের কথা বৌমা, তোমার মনটাও ঐ আজকালকার মেয়েদের মত হয়ে উঠেছে, তাই অত ভয় পাচ্ছ। আমরা বুঝি, যে মেয়ে দুঃখ পাচ্ছে স্বামীর কাছে, সে মেয়ে কখনই স্বামীর মন পায় নি। স্বামীর মন যে সত্যি সত্যি কেড়ে নিতে পারে বৌমা, তার আর কখনও কোনদিনই ভয় নেই।

হরিপ্রিয়া যেন আরও কি বলিতে গিয়া চুপ করিলেন। তিনি আবারও হয়ত কিছু বলিবেন মনে করিয়া ইন্দিরা মুহূর্ত-দুই অপেক্ষা করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, বেশ ত, সেই অবসরই আমাকে দিন না মা।

হরিপ্রিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, ছেলের মুখ তাঁহার চোখের সামনে ভাসিতেছিল। হয়ত আরও কিছু বলিতেন কিন্তু সে সুযোগ মিলিল না। সুকুমারের সেই বিলাত ফেরৎ কাকা আসিয়া পড়িলেন; কহিলেন, বৌমাকে একটু আমাদের ওখানে নিয়ে যাই বৌদি—গাড়িটা এসেছে যখন! আবার রাত্রে ফিরিয়ে দিয়ে যাব'খন খাওয়াদাওয়ার পর—

তিনি তিন চার মাইল দূরেই হাকিমী করেন, মোটরে যাওয়া-আসা চলে। ইতিপূর্বেও বধূকে তিন-চারদিন লইয়া গিয়াছেন। সুতরাং হরিপ্রিয়া আপত্তি করিতে পারিলেন না, বরং তাহাকে সাজাইতে বসিলেন। কাকা খোঁজ করিয়া সুকুমারের ঘরে আসিয়া কহিলেন,

তোর কাকীমা ব'লে দিয়েছে, বৌমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তুই-ও কেন চল্ না—বরং খাওয়া-দাওয়া ক'রে তুই-ই নিয়ে চলে আস্‌বি।

অকস্মাৎ যেন সুকুমার বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমার জন্যে ত আর আয়োজন নয়। যাকে তোমরা চাও, তাকেই নিয়ে যাও। আমি যাব না—

কাকা ইহাকে একটা রসিকতা মনে করিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, হ্যাঁ, প্রায় তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৌমা আসতে যেন তুই ব্যাকগ্রাউণ্ডে পড়ে গেছিস্!...নে, চট্ ক'রে তৈরী হয়ে নে এখন—

সুকুমার ততক্ষণে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়াছে। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে কহিল, না ছোট্‌কা, সত্যিই আমার শরীরটা ভাল নেই আজ!

ও, আচ্ছা আচ্ছা, থাক তা'হলে। আমিই বৌমাকে নিয়ে যাই—আবার পৌঁছে দিতে হবে আর কি!

তিনি চলিয়া গেলেন। সুকুমার আগে কী একটা বই পড়িতেছিল, পুনরায় সেটায় মন দিল, কিন্তু আর যেন পড়া গেল না। অক্ষরগুলি চোখের সম্মুখে একাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার দুই চোখও যেন জ্বালা করিতেছিল। বইটা বৃথা চোখের সামনে মেলিয়া খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর সে উঠিয়া পড়িল এবং অন্যমনস্কভাবেই বারান্দাটা পার হইয়া বাহিরের দিকে আসিয়া হাজির হইল।

কিন্তু সহসা সেখানে পা দিতেই চমক ভাঙ্গিয়া দেখিল, ইন্দিরা তাহার কাকার সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে। নীল বেনারসী কাপড় একখানা পরণে, সর্বাঙ্গে মণিমুক্তার অলঙ্কার। সহসা মনে হইল যেন চোখের সামনে একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া ও পাশের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।......

প্রথম প্রথম সে চেষ্টা ছাড়ে নাই। স্ত্রীর মন জয় করিবার যত রকম উপায় বইয়ে পড়া ছিল এবং বন্ধুবান্ধবদের মুখে শোনা ছিল তাহার সবগুলিই সে একে একে প্রয়োগ করিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তাহার সেবা-পরায়ণা এবং একান্ত বাধ্য বধূকে সে কিছুতেই জয় করিতে পারে নাই। সে চাহিলে ইন্দিরা সব কিছুই করিতে প্রস্তুত কিন্তু তাহাতে সুকুমারের মন ওঠে না, সে চায় ওপক্ষ হইতে একটা সাড়া, একটা আবেগ —তাই প্রতিদিন এবং প্রতিরাত্রি তাহার কাছে বিষাক্ত হইয়া যাইতেছে, কিছুতেই সে-সাড়া মিলিতেছে না।......

সেদিন বহু রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে পায়চারী করিয়া সুকুমার স্থির করিয়া ফেলিল যে সে ইন্দিরাকে উপেক্ষাই করিবে। সম্পূর্ণভাবে সব রকমেই তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া সে বুঝাইয়া দিবে নিজের মূল্য। সাধ্যসাধনা অনেক করিয়াছে সে, আর না—

সেই প্রতিজ্ঞামত সে সেদিন রাত্রে আহারের পর মাথার শিয়রে আলোটা রাখিয়া একখানা মাসিকপত্র লইয়া শুইয়া পড়িল, এবং রাত্রে ইন্দিরা যখন তাহারই জন্য জল ও পান লইয়া প্রবেশ করিল তখন একবারও মুখ তুলিয়া চাহিল না, কিংবা কোন সম্ভাষণও করিল না। ইন্দিরা একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু সে-ও কোনও কথা কহিল না। জানালাগুলা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া একটা জানালার সম্মুখে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তাহার পর বেশ সহজভাবেই আসিয়া বিছানার এক পাশে শুইয়া পড়িল।

সুকুমার আরও অনেকক্ষণ সেইভাবে কাগজখানা চোখের সামনে ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। গত এক ঘণ্টার মধ্যেও তাহার পাতা ওল্টাইবার দরকার হয় নাই, সে প্রয়োজন আর হইলও না, খানিকটা পরে সেও আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু ঘুম তাহার হইল না। অথচ যাহার জন্য তাহার চোখে

সারারাতেও তন্দ্রা নামিল না, সে মানুষটি ঠিক তাহার পাশেই শুইয়া অগাধে ঘুমাইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি এপাশ-ওপাশ করিয়া একেবারে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়া সুকুমার স্বপ্ন দেখিল সতীশকে, সে যেন ম্লানমুখে তাহারই পাশে পাশে দীর্ঘ রাস্তা চলিয়াছে, অথচ কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না।

৬

আরও দুই-তিনটা দিন এইভাবে গেল। দিনে বা রাত্রে সুকুমার কখনই ইন্দিরার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করে না, সামনাসামনি দেখা হইলেও না। ইন্দিরাও চুপ করিয়াই থাকে। সে যেমন দেবর-ননদদের সহিত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত তেমনিই বেড়ায়। বাড়ীর ছোট ছেলে-মেয়ের দল তাহার জন্য পাগল, বড়দের ত কথাই নাই। এইভাবে সকলের স্নেহের কেন্দ্র হইয়া ইন্দিরার দিন ভালই কাটে, স্বামীকে জীবন হইতে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও তাহার ক্ষতি হয় না।

দূর হইতে তাহার এই আনন্দ-সমারোহ, এই ঔদাসীন্য সুকুমার দেখে আর পুড়িতে থাকে। এ যেন বেড়াজাল, যেখানে পথ বলিয়া মনে হয় সেইখানেই বাঁধন আরও শক্ত করিয়া পায়ে আঁটিয়া ধরে। তিন চারদিন মনে মনে জ্বলিয়া অবশেষে একদিন সুকুমার অকারণে ফাটিয়া পড়িল। সহসা আপন মনেই কটূক্তি করিয়া কহিল, কুকুরকে 'নাই' দিলে মাথায় ওঠে, এ'ত জানা কথা!···বন্ধু বান্ধবেরা দু'শোবার বারণ করেছিল যে, ও বিড়ি-ওলার ঘরের মেয়ে নিয়ো না, তোমাদের ঘরে ওকে একদম মানাবে না—তাদের কথা না শুনেই এই হাল আমার!···হাঘরের মেয়েকে কুড়িয়ে এনে ঘরে ঠাঁই দিয়েছি, বাস্ আর যাবে কোথায়! একেবারে

মাথায় চড়ে বসে আছে।...পড়ত কোন কুলি-মিস্ত্রির পাল্লায়, দু'বেলা চুলের ঝুঁটি ধরে ঘা-কতক ক'রে দিত ত বেশ থাক্‌ত! আমাদের কাজ নয় এসব মেয়ে চরানো—

ইন্দিরা তখন আলমারীর সামনে বসিয়া তাহারই কতকগুলা কাচা কাপড়-জামা সাজাইয়া তুলিতেছিল। কথাটা আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার পর আবার তেম্‌নি সহজভাবেই নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। সুকুমার নিজেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়া কী যেন একটা আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইন্দিরা নির্বিকার, তাহার মুখের একটি রেখাও বিচলিত হইল না। সেদিকে চাহিলে একথা মনেই হয় না যে তাহার কাছে অন্য কোন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে বা সে কোন কথা কহিয়াছে।

সুকুমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এতবড় অপমানেও যে ইন্দিরা চুপ করিয়া থাকিবে, ইহা সে কখনও কল্পনা করে নাই। নিজেরই অপমানের আঘাতে বিহ্বল হইয়া সুকুমার কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে নতমুখী ইন্দিরার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর একপ্রকার ছুটিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সারাদিন আর সে লজ্জায় কিছুতেই ইন্দিরার কাছাকাছি আসিতে পারিল না, অপরাহ্নের দিকে যখন দূর হইতে দেখিবার মত সাহস ফিরিয়া আসিল তখনও দেখিল, ইন্দিরা প্রতিদিনকার মতই হাসিখুশির মধ্য দিয়া শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবার খুচরা কাজগুলা করিয়া যাইতেছে। তাহার শান্ত প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া কোন মতেই বুঝিবার উপায় নাই যে, এতবড় একটা ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে।

সুকুমার স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহা গুণ না দোষ, মনুষ্যত্বের—না ঐ বস্তুটির অভাবের পরিচায়ক, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। শুধু বার বার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল—

এত কাণ্ড করিয়া, বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা করিয়া, তাহা হইলে কি একটা পাষাণ-মূর্ত্তিই সে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে? উহার মধ্যে কি কোথাও কোন প্রাণ নাই?

সে-রাত্রিটা সে ইন্দিরা আসিবার আগেই ঘুমের ভান করিয়া এড়াইয়া গেল, পরদিনও প্রায় সেই অবস্থা। অথচ দেখে ওপক্ষের কোন দিকেই কোন মাথা ব্যথা নাই। দোষ যে করে নাই, সে-ই যেন চোরের মত শাস্তি ভোগ করিতেছে—যে অপরাধিনী তাহার আনন্দলীলার কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই। এ যেন অসহ্য বোধ হয়, কিন্তু উপায় কি? নিজের বিষ নিজেরই সর্বাঙ্গে জ্বালার সৃষ্টি করে।

তাহার আরও অসহ্য বোধ হয় এই দেখিয়া যে, আর সকলেই বেশ আছে! তাহার পরেই যে ভাই, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, সে-ত ক্ষুদ্র নবাব বনিয়া গেছে! তাহার প্রত্যেকটি কাজ বৌদিদির করিয়া দেওয়া চাই, নহিলে কিছুই তাহার পছন্দ হয় না। অবশ্য এজন্য তাহার সাধনাও বড় কম নয়। হঠাৎ একদিন সুকুমার আবিষ্কার করিল যে, সে একরাশ ভাল বিলাতী চকোলেট পুকুরপাড়ে ফেলিয়া দিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া জবাবদিহির পর কারণটা শোনা গেল যে, বৌদিদি নাকি একদিন চকোলেটের সঙ্গে যে ছবিগুলি থাকে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, ফলে তাঁহাকে ছবি যোগাইবার জন্যই এত চকোলেট কেনা হইয়াছে। চকোলেট সে নিজে খায় না, ইন্দিরা ত নয়ই—সুতরাং এগুলি ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় কি? সুকুমার হিসাব করিয়া দেখিল যে, এই ক'মাসে যত টিফিনের পয়সা সে পাইয়াছিল সবগুলিই এই চকোলেট কিনিতে ব্যয় করিয়াছে।

ছোট দু-টি বোন ত সর্বদা ছায়ার মত বৌদিদিকে জড়াইয়া আছে। দিনের বেলায় একটু ফাঁক কোথাও পাইবার উপায় নাই। কাকা—আগে কদাচিত বাড়ি আসিতেন, এখন কাছারী শেষ করিয়াই আসিয়া হাজির

হন, এবং বাড়িতে পা দিয়াই, 'আমার বৌমা কোথায় গো?' বলিয়া হাঁক দেন। কোন দিন সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিজের বাসায় লইয়া যান, কোন দিন বা ন'টা-দশটা পর্য্যন্ত এখানে কাটাইয়া বিদায় লন। আর উপহার যে কতরকমের কত জিনিস তিনি দিয়াছেন এবং দিতেছেন, তাহার বোধ করি হিসাবও নাই। কর্তা স্বয়ং ত আজকাল 'মা-মণি' ভিন্ন ডাকেন না, একটি মুহূর্ত চোখের আড়ালে গেলে অস্থির হইয়া ওঠেন। এমন কি দাসী-চাকররা পর্য্যন্ত যেন কোন্ যাদুতে এই মেয়েটীর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কর্তা-গিন্নীর কথা বরং তাহারা অবহেলা করে কিন্তু এই একফোঁটা মেয়ের একটি অস্ফুট অনুরোধ তাহাদের কাছে যেন বেদবাক্য।

অবশ্য ইন্দিরা আসিবার পর সমস্ত বাড়িটায় যে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলা আসিয়াছে একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আগে উপকরণ ছিল যথেষ্টই, কিন্তু তবু স্বাচ্ছন্দ্য মিলিত না—এখন প্রত্যেকরই প্রত্যেকটি জিনিস হাতের কাছে জোগানো থাকে। চারিদিকেই চমৎকার একটি নিপুণতার ছাপ, সেদিকে চাহিলে যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। গৃহিণী প্রায়ই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মা-লক্ষ্মী আসবার আগে যেন ভূতের বাসা হয়েছিল—

এ সবই সুকুমার দেখে। সকলেই সুখী, সে ছাড়া। অথচ সে যেদিন ইন্দিরাকে সকলের অজ্ঞাতে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল সেদিন ঠিক উলটাটাই ভাবিয়াছিল! পিতার ক্রুদ্ধ মুখ, মাতার অশ্রু, ভাইবোনের বিদ্রূপ ও তিরস্কার—আর এই সকলের বিপক্ষে দাঁড়াইবার মত সম্বল একখানি সুন্দর মুখের সপ্রেম দৃষ্টি, এই ছিল সেদিনকার কল্পনা। এ যেন বিদ্যাপতির নায়িকার অবস্থা, 'দারিদ্র্য বলিয়া লছমী সেবিতে মাণিক হারানু হেলে!'...বেশী সুখের আশায় শান্তিটা গেল নষ্ট হইয়া।

সে দেখে আর জ্বলে! সহস্র উপায় ভাবে স্ত্রীর চিত্ত জয় করিবার; কোনটা পরীক্ষা করিয়া ব্যর্থ হয়, কোনটা পরীক্ষা করিবার পূর্বেই হাল ছাড়িয়া দেয়। কখনও বা মনকে প্রবোধ দেয় যে সবই ঠিক আছে, যেমন স্বাভাবিক জীবনে ঘটে তেমনিই ঘটিতেছে; তাহারই কেমন একটা বিকৃত-মনোবৃত্তি-প্রসূত কল্পনা ছিল, জীবনে সত্য যা ঘটে তাহার সহিত সে কল্পনা খাপ খাইতেছে না। এ তাহার অতিরিক্ত নভেল পড়ার ফল, কিংবা লিভারের অসুখ। কিন্তু মনকে যতই বোঝায়, মন বলে, 'নহে, নহে, নহে—'

এমনিভাবে অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইতে একদিন সুকুমার মন স্থির করিয়া ফেলিল, সে কলিকাতাতেই ফিরিয়া যাইবে। হঠাৎ যে কারণে এ বাসনা হইল তাহার, তাহারও একটা ইতিহাস আছে—

সেদিন মনটা সকাল হইতেই খারাপ হইয়া ছিল তাহার। চার পাঁচদিন যাবৎ সে ইন্দিরার সহিত কথাবার্তাই বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, আশা ছিল ইন্দিরা অন্তত ইহাতে একটু ক্ষুণ্ণ হইবে, হয়ত বা ভয়ও পাইবে, কিন্তু সে আশাও সফল হয় নাই। ইন্দিরা প্রয়োজন মত যাচিয়া কথা বলে, প্রয়োজন না থাকিলে বলে না। আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে, সুকুমারের অভিমান লক্ষ্যই করে না যেন। এই ব্যর্থতার ইতিহাসটা ভাবিতে ভাবিতে সেদিন দুপুর বেলা হঠাৎ বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দেখে যে প্রবোধবাবু একজন হিন্দুস্থানীর সহিত নিবিষ্টচিত্তে কি আলাপ করিতেছেন। এ হিন্দুস্থানীকে সুকুমার চিনিত। এ জহুরী, প্রবোধবাবু ইহার মারফৎই হীরা-জহরৎ ক্রয় করিতেন।

বাড়িতে কোন ক্রিয়াকলাপ নাই, অকস্মাৎ জহুরীকে কি দরকার থাকিতে পারে বুঝিতে না পারিয়া সুকুমার কাছে আসিয়া দেখিল

হাতের তালুতে একটা হীরা রাখিয়া তাহার বাবা হেঁট হইয়া লেন্স্-এর সাহায্যে তাহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। হীরাটি একটু বড়ই, এবং দামও যে কম নয় তাহা পাথরটার অস্বাভাবিক দীপ্তির দিকে চাহিলেই বোঝা যায়।

সে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ও পাথরটা কি হবে বাবা, কিনবেন নাকি ?

প্রবোধবাবু মাথা তুলিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, হ্যাঁরে। মনে করছি, আসছে পুজোয় বৌমাকে একটা কণ্ঠী গড়িয়ে দেব। মুক্তার কণ্ঠী, মাঝে এইটের ধুকধুকি হবে। কী বলিস—মা-মণিকে বেশ মানাবে, না ?

অকস্মাৎ যেন সুকুমারের মাথায় খানিকটা উত্তপ্ত রক্ত উঠিতে শুরু করিল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ মন হইতে চলিয়া গেল ; এতদিন যেটা মনের ভিতর জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই ঘুরিতেছিল সহসা সেটা স্থির প্রতিজ্ঞার রূপে বাহির হইয়া আসিল। সে প্রবোধবাবুর প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই কলকাতায় যাব বাবা !

বিস্মিত হইয়া প্রবোধবাবু প্রশ্ন করিলেন, সে কি ? কেন রে ?

হীরাটার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সুকুমার উত্তর দিল, 'ল'-টা ত সবই পড়া রয়েছে, মিছিমিছি ওটা পচিয়ে রেখে লাভ কি। মনে করছি—ফাইনালটা দিয়ে দেব এবার।

প্রবোধবাবু ঈষৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, ও ! তা আজই যাবি একেবারে ?···দিনটা আবার কেমন আছে আজ—

সুকুমার দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, আজই ভালো। অনেকদিন থেকেই মনে করছি, আজ-নয়-কাল ক'রে অনর্থক দেরি হয়ে যাচ্ছে। ফাইনালের আর বেশী দেরী ত নেই। এর পর গেলে আর তৈরি হ'তে পারব না।

প্রবোধবাবু কহিলেন, কিন্তু দিনটা কেমন দেখলে হ'ত না—অশ্লেষা-মঘা নেই ত!

তাচ্ছিল্যের সহিত সুকুমার জবাব দিল, হ্যাঁ, এই ত দু-ঘণ্টার পথ—তার আবার দিন দেখা—

সে উপরে চলিয়া গেল। প্রবোধবাবুও হীরাখানা জহুরীর হাতে ফেরৎ দিয়া কহিলেন, তুমি কাল একবার এস তারাচাঁদ, আজ আর দেখবার সময় হবে না।

তারাচাঁদ চলিয়া গেল। প্রবোধবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া একাই বসিয়া রহিলেন। সুকুমারের এই সহসা-জাগরিত কর্তব্যবুদ্ধির মধ্যে কোথায় একটা মস্ত গলদ আছে সেইটাই বোধ করি চিন্তা করিতেছিলেন। খানিকটা পরে বাড়ির মধ্যে আসিয়া বধূর উদ্দেশে হাঁক দিলেন, আমার মা-মণি কোথায় গো!

ইন্দিরা ছুটিয়া আসিল, বাবা ডাকছেন?

তাহাকে দেখিয়াই প্রবোধবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, হ্যাঁগো মা লক্ষ্মী, ব'সো এখানে—

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন, মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, বেহায়া ভাববে না?

বলুন না, কী বলবেন—

গলা নামাইয়া প্রবোধবাবু কহিলেন, মা, খোকার সঙ্গে কি তোমার কোন ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে?...আমাকে লুকিও না, ঠিক ক'রে বলো। আমার কাছে কোন লজ্জা নেই মা—

ইন্দিরা তাহার আয়ত চক্ষু তুলিয়া স্থির দৃষ্টিতেই শ্বশুরের দিকে চাহিল, কই না ত!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া প্রবোধবাবু কহিলেন, তবু ভাল, আমি ভাবলুম রাগারাগি ক'রেই বুঝি চলে যেতে চাইছে—

ইন্দিরা যেন এক মুহূর্তের জন্য একটু চমকিয়া উঠিল। তাহার পরই আবার চক্ষু নত করিয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

প্রবোধবাবু কিছুক্ষণ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে নতমুখী বধূর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, এই জন্যেই ডাকছিলুম। আচ্ছা, তুমি যাও মা, এখন বিশ্রাম করোগে—

ইন্দিরা উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

৭

সুকুমারের এবারে প্রতিজ্ঞার নড়চড় হইল না। সে যথাসময়ে বৈকালিক চা-পানের পর স্যুটকেশ গুছাইয়া লইয়া কলিকাতা রওনা হইল। হোস্টেলের ঘর সে ছাড়ে নাই, বিছানাপত্রও সেখানে প্রস্তুতই আছে, সুতরাং এমন কিছু উদ্যোগ-আয়োজন নাই কিংবা কোন দুর্ভাবনারও কারণ ছিল না।

যাত্রার আগে সুকুমার ইন্দিরাকে দেখিবার আশা করে নাই। কিন্তু হরিপ্রিয়া পান দিবার অছিলায় একরকম জোর করিয়াই তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। সে আসিয়া পানের ডিবাটা মেলিয়া ধরিয়া কহিল, মা ব'লে দিলেন খুব সাবধানে থাকতে—

সুকুমার চকিতে একবার ইন্দিরার মুখটা দেখিয়া লইল, বোধ হয় তখনও সে মুখে একটু বেদনার ছায়া আশা করিতেছিল, কিন্তু তাহার ভাবলেশহীন মুখ হইতে অনুরোধটা বাহির হইয়া আসিল কতকটা যান্ত্রিক ব্যাপারের মতই। একটা পান তুলিয়া লইয়া সুকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, কথাটার উত্তর দিবারও প্রবৃত্তি রহিল না।

গাড়ীর সময় তখন আসন্ন, সে আর অন্তঃপুরেও কোথাও দাঁড়াইল না,

হন্ হন্ করিয়া নামিয়া একেবারে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। বার বার নিজের অভিমানের কাছেই প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, আর বহুদিন এ-মুখো হইব না, আমাকে বাদ দিয়া আর সকলেই যদি সুখী হয় ত হোক।

কিন্তু দৈব বিরূপ। সুকুমারের আদেশে কোচম্যান একটু জোরেই গাড়ী চালাইয়াছিল, স্যাকরাদের আমবাগানের বাঁকে যে একটা গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল তাহা সে দেখিতে পায় নাই। যখন দেখিল, তখন প্রাণপণে রাশ টানিয়া ধরিয়াও ঘোড়াকে সামলাইতে পারিল না, গাড়ী একেবারে গিয়া পড়িল গরুর গাড়ীর ঘাড়ে।

তাহার পরের ব্যাপার সাধারণ; গাড়ীটা পাশের খানায় উল্টাইয়া পড়িল। খানার ধারে স্যাকরাদের একটা সজ্‌নে গাছ থাকায় একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল না, কাৎ হইয়া লাগিয়া রহিল। ক্যোচম্যান, ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর চালক সাংঘাতিক জখম হইল, অতি অদ্ভুত উপায়ে শুধু গরু দুইটা বাঁচিয়া গেল।

সুকুমারের রক্তপাত খুব বেশী না হইলেও চোট লাগিয়াছিল দারুণ, সে কতকটা অজ্ঞানের মতই হইয়া পড়িয়াছিল। চারিদিক হইতে যখন হৈ হৈ করিয়া লোকজন আসিয়া পড়িয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল, তখন ব্যাপারটা কতকটা বুঝিতে পারিলেও তাহার নড়িবার বা কথা বলিবার সামর্থ্য ছিল না। দৈবক্রমে স্কুলের তখন ছুটির সময়, ছেলেরা কাছেই ছিল, তাহারা স্কুলেরই একটা চেয়ারের উপর তাহাকে বসাইয়া সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বাড়িতে লইয়া আসিল।

ঐ অবস্থাতে সুকুমারকে ফিরিতে দেখিয়া হরিপ্রিয়া কোন প্রশ্ন না করিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রবোধবাবুর মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল, তিনি গোলমাল শুনিয়া বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানেই বসিয়া

পড়িলেন। কথা কহিবার, প্রশ্ন করিবার বা কোন নির্দেশ দিবার মত তাঁহার অবস্থা রহিল না।

শুধু ইন্দিরা ভিতরে কী কাজে ব্যস্ত ছিল, সে বাহির হইয়া আসিয়া ব্যাপারটা দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, একেবারে সামনে আসিয়া ছেলেদের সম্বোধন করিয়া বলিল, আপনারা যখন এতই করেছেন, তখন দয়া ক'রে ওঁকে একেবারে ওপরে নিয়ে আসুন, শোবার ঘরে। ঠাকুরপো, আমি ওঁকে দেখছি, তুমি ভাই বাবাকে একটু দেখো, ওঁর মাথায় একটু হাওয়া করো। আর ক্ষীরিকে বলো, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দিক। লক্ষ্মী ভাইটি, আর দাঁড়িয়ে থেকো না—

তাহার পর ছেলেদের পথ দেখাইয়া সে একেবারে নিজের শয়ন কক্ষে লইয়া আসিল এবং খাটের উপর সুকুমারকে সযত্নে শোয়াইয়া দিয়া প্রথমেই জামাগুলা কাঁচি দিয়া কাটিয়া খুলিয়া দিল। ছেলেরা এমনিই খুলিতে যাইতেছিল, সে বাধা দিয়া কহিল, দরকার নেই আর অনর্থক নাড়ানাড়ি ক'রে—একটা জামার দাম কতই বা—! আপনারা বরং দয়া ক'রে কেউ একজন ডাক্তারবাবুকে খবর দিন, এখনো হয়ত তিনি আমাদের ডাক্তারখানাতেই আছেন—

একটী ছেলে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেল। ইন্দিরা খানিকটা ঠাণ্ডা জল আনিয়া প্রথমে মুখে চোখে অল্প একটু জলের ঝাপটা দিল, তাহার পর নিজের আঁচলটা ভিজাইয়াই সুকুমারের সর্বাঙ্গে বুলাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে প্রবোধবাবু, হরিপ্রিয়া দুজনেই আসিয়া পড়িয়াছেন। কাজের মজাই এই যে, কেহ একবার আরম্ভ করিয়া দিলে বাকী সকলেই নিজেদের কর্তব্য বুঝিতে পারে। তাঁহারা আসিয়া কতকগুলা জিনিসপত্র সরাইয়া বিছানার পাশে খানিকটা জায়গা করিয়া দিলেন,

জানলাগুলা সব খুলিয়া ঘরে আরও আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পর প্রবোধবাবু ছেলেদের ঘরের অপর প্রান্তে সরাইয়া বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং হরিপ্রিয়া ইন্দিরার নির্দেশ মত একটা পাখা লইয়া ছেলের শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

একটু পরেই ডাক্তারবাবু আসিয়া পড়িলেন। সকলে আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ডাক্তারবাবু নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, না, ভয়ের কোন কারণ নেই। শুধু শকটাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, নইলে এমন কোথাও লাগেনি।

পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া খস্ খস্ করিয়া একটা প্রেস্‌ক্রিপসান লিখিয়া চাকরের হাতে দিলেন, সে ডাক্তারখানায় দৌড়িল, তাহার পর তিনি নিজেই কী একটা ঔষধ ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তুলার সাহায্যে অল্প অল্প করিয়া যে স্থানগুলি কাটিয়া গিয়াছিল, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যে কখন যে ইন্দিরা তাহার জমিদার-বধূর সম্ভ্রম এবং লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে ঔষধে তুলা ভিজাইয়া হাতের কাছে জোগাইয়া দিতেছিল, তাহা, এমন কি ডাক্তারবাবুও বুঝিতে পারেন নাই। প্রবোধবাবু বা হরিপ্রিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহাদের তাহা লক্ষ্য করিবার কথা নয়।

প্রথম লক্ষ্য করিল রোগীই। এইসব শুশ্রূষার মধ্যেই এক সময়ে সে চোখ মেলিয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহার চৈতন্য ভাল করিয়া ফিরিয়া আসে নাই, মিনিট-দুই পরে যখন ব্যাপারটা দৃষ্টি ভেদ করিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছিল তখন সে চমকিয়া উঠিল দেখিল, ইন্দিরা ডাক্তারের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার সেবা করিতেছে, ইন্দিরার মুখে উদ্বেগের ছায়া—

সুকুমার নড়িয়া উঠিতেই সকলের চমক ভাঙ্গিল। হরিপ্রিয়া

একেবারে মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, প্রবোধবাবু হেঁট হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এখন কেমন বুঝছ বাবা? কষ্ট হচ্ছে না ত?

ইন্দিরা মুখের উপর ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল, কিন্তু কাজ বন্ধ করিল না।

সুকুমারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ইন্দিরা তাহার সেবা করিতেছে। ইন্দিরা তাহার জন্য উদ্বিগ্ন, এই ব্যাপারটার মধ্যে এমনই নূতনত্ব, এমনই বিস্ময় আছে যে, দৃশ্যটা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার মনে মোহের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই অনুভূতিতে ব্যাঘাত ঘটায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, ও-গুলো কি দিচ্ছেন ডাক্তারবাবু, বড্ড জ্বালা করছে যে!

ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, না, এই যে হয়ে গেছে—আর জ্বালা করবে না।...যোদ্ধা আপনি এখন একদম নড়বেন না। কিংবা কথাও বলবেন না, আর একটু যাক্—

সুকুমার আর কথা কহিল না। তাহার এ-অবস্থার সমস্ত ইতিহাসটা ভাল করিয়া মনেও পড়ে নাই তখনও পর্য্যন্ত, সবটা সে বুঝিতেও পারিতেছিল না, শুধু তাহার অর্ধ-জাগ্রত চৈতন্যের মধ্যে একটা কথা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ইতিমধ্যেই, যে সে গুরুতরভাবে পীড়িত হইয়াছে এবং ইন্দিরা তাহার সেবা করিতেছে! এই নূতন তথ্যটাই সে চোখ বুজিয়া মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল—এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটা।

ঔষধ আসিয়া পৌছিল। ডাক্তারবাবু কাঁচের গ্লাসে ঢালিয়া নিজে এক দাগ খাওয়াইয়া দিলেন এবং চেয়ারে জাঁকিয়া বসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, আরও খানিকটা না দেখিয়া তিনি নড়িবেন না। হরিপ্রিয়া শিয়রে বসিয়া তেমনি বাতাস করিতেছেন, সুতরাং আপাতত কোন কাজ নাই। প্রবোধবাবু কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই কিংবা প্রয়োজনও নাই বলিয়া ছেলেগুলিও একে একে বাহির হইতে শুরু করিল। ইন্দিরা মিনিটখানেক বোধ হয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন এই সব নড়া-চড়ায় যেন তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, সে চট্ করিয়া আর একটা দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া প্রবোধবাবুকে চুপি চুপি কহিল, বাবা, এঁরা এত কষ্ট করলেন, এমনি এমনি চলে যেতে দেওয়া কি ঠিক হবে ?···

প্রবোধবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাই ত, সে-ত ভারি অন্যায় হবে, কিন্তু—কী করা যেতে পারে তাও ত বুঝতে পারছি না।

মৃদুকণ্ঠে ইন্দিরা জবাব দিল, আপাততঃ একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিলে হ'ত না ?

ঠিক ! ঠিক ! বাবা, তোমরা এক মিনিট দাঁড়াও—না না, তোমরা ঐ বৈঠকখানায় বসবে চলো। মা মণি, তুমি তাহ'লে—

ইন্দিরা মুচ্‌কি হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার বিদায় লইতে প্রবোধবাবু আসিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসিলেন। সুকুমার তখন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। বোধকরি ঘুমাইয়াই পড়িয়াছে। হরিপ্রিয়া তখনও তাহার মাথায় বাতাস করিতেছিলেন, তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া প্রবোধবাবু ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, খোকা বোধ হয় ঘুমোল, না ?

হরিপ্রিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, হ্যাঁ।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া প্রবোধবাবু তেমনি চুপি চুপিই কহিলেন, বিপদে না পড়লে, কার কি দাম—বোঝা যায় না। উঃ—আজ বৌমা না থাকিলে কী কাণ্ডই হ'তো তাই ভাবছি !···যেমন তুমি, তেমনি আমি দুজনেই ত বসে পড়লুম···ঐটুকু মেয়ের কি উপস্থিত বুদ্ধি বলো দিকি ! এক লহমা ভাবলে না কিংবা হৈ-চৈ কান্নাকাটি কিচ্ছু করলে না—একেবারে কাজে লেগে গেল, আশ্চর্য্য।

প্রবোধবাবু চুপ করিলেন। সমস্ত কথাগুলি মনে করিয়া হরিপ্রিয়ার চোখে বোধ করি জল আসিয়া গিয়াছিল, তিনি আঁচলে চোখ মুছিয়া গাঢ়-স্বরে কহিলেন, মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী! খোকা বেঁচে থাক্ আর বৌমা বেঁচে থাক—আর কিছু চাই না, আর কিছু ভাবতেও হবে না তাহ'লে।

সহসা তিনি চুপ করিয়া গেলেন, কারণ সুকুমার এই সময় একটু নাড়িয়া চাড়িয়া উঠিল; পাছে ঘুম ভাঙ্গে এই আশঙ্কায় হরিপ্রিয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, প্রবোধবাবুও উৎকণ্ঠ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সুকুমার আর বিশেষ নড়াচড়া করিল না। হরিপ্রিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

সুকুমার জাগিয়াই ছিল, সে ভাবিতেছিল ইন্দিরার কথা। বাবা-মার কথা কানে যাইতে অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল বলিয়াই সে মুখটা বালিশের দিকে আরও গুঁজিয়া দিয়াছিল, শুধু দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্যই। সে-ও ঐ কথাটাই ভাবিতেছিল, বিপদে না পড়িলে কাহারও যথার্থ মূল্য বোঝা যায় না! এই ইন্দিরাকে সে এতদিন কী ভুলই না বুঝিয়াছিল। বেচারী ইন্দু! তাহাকে কটু কথা বলিতে ইতস্তত ত করেই নাই, এমন কি তাহার পিতার দারিদ্র্যকে উপলক্ষ্য করিয়াও কত অপমান করিয়াছে। বেচারী একটি প্রতিবাদ করে নাই, রাগ করে নাই, নীরবে সমস্ত সহিয়াছে, উপরন্তু পরক্ষণে সুকুমারেরই স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছে, শান্ত স্মিত মুখে—

যে প্রেম বক্ষ ভরিয়াই ছিল শুধু প্রকাশের অপেক্ষায়, এইবার তাহাই যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে ইন্দিরার কাছে ক্ষমা চাহিতে চায়, আর এখনই, এক মিনিটও যেন সবুর সহিতেছে না!

সে আবারও নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। হরিপ্রিয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া উদ্বিগ্ন সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, কী বাবা, কষ্ট হচ্ছে কিছু?

সুকুমার মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি আর কতক্ষণ বসে থাক্‌বে মা এমন ক'রে? তুমি আহ্নিক-পূজো করগে, আমি এখনই ঘুমোব এখন, বাতাস লাগবে না।

বোধ হয় আসল কথাটা হরিপ্রিয়া বুঝিলেন, বিশেষ প্রতিবাদ না করিয়া কহিলেন, তুই কি খাবি এখন কিছু? ডাক্তার বার্লি দিতে বলেছে, পাঠিয়ে দেব বৌমাকে দিয়ে একটু?

প্রথমটা 'না' বলিতেই যাইতেছিল, কিন্তু শেষের কথাটা শুনিয়া সুকুমার কহিল, দাও একটু না হয়—

হরিপ্রিয়া ও প্রবোধবাবু দুজনেই উঠিয়া পড়িলেন। একটু পরেই আঁচলের উপর বার্লির বাটি বসাইয়া ঘরে ঢুকিল ইন্দিরা। বাটিটা টিপয়ের উপর রাখিয়া কাছে গিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এখনও গরম আছে একটু। এখনি খাবে, না ঠাণ্ডা ক'রে দেব?

সুকুমার বাঁ হাত বাড়াইয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, ইন্দু, তোমার কাছে অপরাধ আমার কখনও ঘুচবে না···মাপ চাইব যে সে মুখও বোধহয় নেই।

ইন্দিরার ভাবশূন্য মুখ বোধ হয় এই প্রথম আরক্ত হইয়া উঠিল। সে হয়ত একটু বিস্মিতও হইল। মৃদুকণ্ঠে কহিল, ওসব কথা এখন থাক—দুর্বল শরীর তোমার···এই বার্লিটুকু এবার খেয়ে নাও।

ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেও সুকুমার আর কথা কহিল না, ইন্দিরার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া এক নিঃশ্বাসে বার্লিটা খাইয়া ফেলিল। ইন্দিরা বাটি ধরিয়া রহিল, খাওয়া শেষ হইলে নিজের আঁচল দিয়াই মুখ মুছাইয়া দিল। এ যেন এক বিস্ময়কর অনুভূতি। সুকুমার স্তব্ধভাবে ইন্দিরার এই সেবা-পরায়ণা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। সে বাটিটা বাহিরে রাখিয়া আসিল,

তাহার পর টেবিলের আলোটা সুকুমারের চোখে লাগিতে পারে এই আশঙ্কায় একটা খবরের কাগজ চিম্‌নির গায়ে আড়াল করিয়া দিয়া শিয়রে আসিয়া বসিল বাতাস করিতে।

কিন্তু পাখাটা তুলিতেই সুকুমার কহিল, ওখানে বসলে তোমায় যে দেখতে পাব না ইন্দু, তুমি এইখানে বসো—

সে তাহার পাশটা দেখাইয়া দিল।

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। তোমার এখন ঘুমোনো দরকার। আমি মাথায় বাতাস করছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। ওখানে বসলে তুমি ঘুমোতে দেরী করবে।

তাহার কণ্ঠস্বর দৃঢ়। সুকুমারের আর প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। সে জানে, হয়ত আর বেশী বলিতে গেলে এখনই আবার একেবারে সুর কাটিয়া যাইবে। তাহার চেয়ে এই শাসন উৎকণ্ঠাপ্রসূত, এই কথা কল্পনা করাই ভাল। সে আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটা হাত ইন্দিরার হাঁটুর উপর তুলিয়া দিল, তাহার পর চোখ বুঝিয়া থাকিতে থাকিতে কোন্ এক সময় সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল।

৮

সুকুমারের ঘুম ভাঙ্গিল অনেক রাত্রে। সহসা যেন গালের উপর কাহার একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আচ্ছন্নতা কাটিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিল ইন্দিরা তখনও তেমনি শিয়রে বসিয়া আছে, কিন্তু বোধ করি বাতাস করিতে করিতেই এক সময়ে তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল, সে ঢুলিয়া সুকুমারেরই বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছে। হাতে তাহার তখনও পাখাটা ধরা, কতকটা উপুড় হইয়া

পড়িয়াছে—ঘাড়টা বাঁকিয়া সুকুমারের দিকে মুখটা ফেরানো, সেই অবস্থাতেই অঘোরে ঘুমাইতেছে।

কতখানি শারীরিক ক্লান্তিতে ইহা সম্ভব হইয়াছে ভাবিয়া সুকুমারের বুক স্নেহ ও মমতায় ভরিয়া উঠিল, কিন্তু কনুইতে ভর দিয়া একটু উঠিয়া বসিতেই টেবিলের আলোর একটা রেখা ইন্দিরার মুখে আসিয়া পড়িয়া তাহার ঘুমন্ত মুখটা এতই সুন্দর দেখাইল যে, কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সে মোহাবিষ্টের ন্যায় শুধু তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল, তাড়াতাড়ি কোন স্বাচ্ছন্দ্য দিবার কথা ভাবিতেও পারিল না। ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক হইয়া আছে, তাহার মধ্য দিয়া সাদা দাঁতগুলির আভাস পাওয়া যাইতেছে, চোখের সুদীর্ঘ পক্ষ্মরাজি শুভ্র রক্তিম গণ্ডের উপর অনেকখানি ছায়া বিস্তার করিয়াছে, সুন্দর মসৃণ কপালের উপর একটি সিঁদুরের ফোঁটা—সবটা মিলিয়া যেন নিমেষে মুগ্ধ করিয়া দিল।

মিনিট দুই তিন নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিবার পর তাহার নিজেরই ক্লান্তিবোধ হইল। কনুইয়ের উপর ভর দিয়া ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতে কষ্টও হইতেছিল। সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ভাল লাগিল না, শুইয়া পড়িয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ইন্দিরাকে সোজা করিয়া শোয়াইবার চেষ্টা করিল তাহাতেও সুবিধা হইল না। কাজটা যত সহজ মনে হইয়াছিল, দেখা গেল ততটা সহজ নয়। তখন আবার উঠিয়া বসিয়া ইন্দিরাকে একেবারে নিজের পাশে টানিয়া লইল। সে এমনই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল যে, অত টানাটানিতেও আগে তাহার ঘুম ভাঙ্গে নাই, ভাল করিয়া মাথায় বালিশটা টানিয়া দিবার সময় শুধু একবার চোখ মেলিল; ঘুমের ঘোরে কী বুঝিল কে জানে, কেমন একটা বিহ্বলভাবে হাসিয়া সে সুকুমারকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিল। পরক্ষণেই তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

ইহা হয়ত স্বপ্ন, ইহা হয়ত ঘুমের ঘোর—তবু সুকুমারের সর্বাঙ্গ

শিহরিয়া উঠিল। সে ঘটনাটা অনুভব করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সমস্তটা যেন মাথার মধ্যে তাল পাকাইতে লাগিল। তাহার সমস্ত কল্পনা আজ হয়ত-বা মিথ্যার মধ্য দিয়াই সম্ভব হইয়াছে, তবু ত তাহা ঘটিয়াছে, তবু ত সে ইন্দিরার নিবিড় বাহুবন্ধন অনুভব করিতেছে! সে যেন ভরসা করিয়া জোরে নিঃশ্বাসও ফেলিতে পারিতেছিল না। পাছে এই মিথ্যা সুখটুকুও চলিয়া যায়।...

এম্‌নি করিয়াই সারারাত্রি কাটিয়া গেল। ইন্দিরার ঘুম ভাঙ্গিল একেবারে ভোরের দিকে। সে প্রথমটা ঘুম ভাঙ্গিয়া ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিল না, তাহার পর তাহার মনে পড়িল যে সুকুমারের মাথায় সে বাতাস করিতেছিল, খুব সম্ভব সেই অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং—। মুহূর্ত দুই তিন মাত্র, তাহার পরই প্রবল লজ্জায় তাহার ললাট, কপোল, কণ্ঠ লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বসিতে বসিতেই সুকুমারের সহিত তাহার চোখোচোখি হইল। সুকুমার তখনও জাগিয়াছিল, সারারাত্রি জাগরণে চোখ দুইটি রক্তিম, চোখের কোলে কালিমা, ইন্দিরার লজ্জা ও বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া সে ক্লান্তভাবে হাসিল।

ইন্দিরা অপ্রস্তুত হইয়া মাথার খোঁপাটা ঠিক করিতে করিতে কহিল, তুমি কি সারারাত ঘুমোও নি?

না রাণী, তোমাকে দেখছিলাম। এমন ক'রে কাছে পাবার ভাগ্য ত হয় না!

ইন্দিরার কান, মাথা গরম হইয়া উঠিল। কহিল ছি ছি। তোমার অসুখ শরীর, এমন ক'রে রাত জাগা কি ঠিক।...আমায় ডেকে দাওনি কেন?

সুকুমার উত্তর দিল না। আঘাতের বেদনা ত ছিলই, তাহার উপর সারারাত একভাবে শুইয়া থাকিবার ফলে তাহার সারা দেহ

তখন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, রীতিমত যন্ত্রণাও শুরু হইয়াছে। সে সোজা হইয়া ভাল করিয়া শুইবার চেষ্টা করিতে গেল, কিন্তু পারিল না বরং যন্ত্রণায় তাহার মুখ চোখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

ইন্দিরা উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিল, পাশ ফিরিয়ে দেব?...দাঁড়াও দাঁড়াও—

ক্ষীণ কণ্ঠে সুকুমার কহিল, বড় ব্যথা ইন্দু, সারাদেহে যেন কি কামড়াচ্ছে—

সে আর কথাও কহিতে পারিল না, গভীর ক্লান্তি ও অবসাদে চোখ বুজিল। ইন্দিরা কিন্তু তাহার যন্ত্রণার কারণটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহার বাঁ হাতটা ভাল করিয়া টিপিয়া রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া দিল, তাহার পর সাবধানে সুকুমারকে পাশ ফিরাইয়া দিয়া এক রকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে পা দিতেই প্রথম যাঁহার সহিত ইন্দিরার দেখা হইল, তিনি হরিপ্রিয়া। পুত্রবধূর মুখের রক্তিমাকে তিনি লজ্জা বলিয়া ভুল করিলেন। ছেলের ব্যথা একমাত্র তিনিই জানিতেন, সেইজন্য কাল রাত্রে দ্বারপথে উঁকি মারিয়া দু'জনকে অত কাছাকাছি ঘুমাইতে দেখিয়া, বধূ উপবাসী আছে জানিয়াও, তিনি ডাকেন নাই। পুত্রের জন্য উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে তাই কিছু উৎফুল্লই দেখাইতেছিল।

কিন্তু সে ভুল তাঁহার শীঘ্রই ভাঙ্গিল।

ইন্দিরা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, মা, ওঁর যন্ত্রণা আবার বেড়েছে, গা-ও যেন একটু গরম বোধ হ'ল—ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকতে হবে।

সে কি! হরিপ্রিয়া একরকম তাহাকে ঠেলিয়াই ঘরে ঢুকিলেন। সত্যই সুকুমারের গা গরম, সে তখন অবসাদে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ডাকাডাকিতেও চোখ খুলিল না, কিংবা কথা কহিল না।

তুমি রাত্রে কিছু টের পাও নি বৌমা?…এই সব ব্যাপার, একটু সাবধানে থাকতে হয়!

তাঁহার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, কোথায় যেন তিরস্কারের স্বর লুকাইয়া ছিল।

ইন্দিরা মাথা হেঁট করিয়া পায়ের আঙ্গুল দিয়া খাটের পায়াটা খুঁটিতে খুঁটিতে জবাব দিল, বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মা, উনিও ডাকেন নি—

তুমি জেগে থাকবে ব'লেই আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম মা! অতই যদি ঘুম পেয়েছিল, আমাকে ডাকোনি কেন?

ইন্দিরা এ কথার উত্তর দিল না, কিন্তু তিরস্কারে ভাঙ্গিয়াও পড়িল না, কারণ উহার ভিতরের খোঁচাটার মধ্যে সত্য ছিল না। সে শুধু কহিল, আগে ডাক্তারকে খবর দিন মা!

হরিপ্রিয়া রুষ্টস্বরে জবাব দিলেন, তুমিই যাও শ্বশুরকে বলোগে! আমি এখন খোকাকে ছেড়ে যাই কী ক'রে?

তিনি একেবারে সুকুমারের শিয়রে গিয়া বসিলেন!

৯

ইন্দিরা কোনমতে শ্বশুরকে খবর দিয়া পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া ভিতর হইতে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। লজ্জায় যেন তাহার মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিতেছিল। এ কী কাল-ঘুম তাহাকে কাল পাইয়া বসিয়াছিল? সুকুমারের উপর রাগ হইতেছিল ভীষণ। সে না হয় ঘুমাইয়াই পড়িয়াছিল, অমন করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া সারা রাত জাগিবার প্রয়োজন কি ছিল? শুধু শুধু পৃথিবীসুদ্ধ লোকের কাছে তাহাকে লাঞ্ছিত করা।

কিন্তু লজ্জার প্রথম বেগ কাটিয়া গেলে সে মনে মনে উপলব্ধি করিল যে, লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে সে এই ব্যাপারে একটু গর্বও অনুভব করিতেছে যেন! স্বামীর যে ভালবাসা সে চাহে না, তাহারই এই আতিশয্যে তাহার গৌরববোধের কারণ কি? তবে কি, তবে কি সে তাহার অজ্ঞাতসারে সুকুমারের কাছে ধরাই পড়িয়াছে?…

সন্দেহটা মনে দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে শিহরিয়া উঠিল। দুই কান এবং কপালের খানিকটা যেন আগুন হইয়া উঠিয়াছে। সুকুমার তাহা হইলে তাহাকে সত্যই জয় করিল নাকি?

ইন্দিরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া বিশেষ শেখে নাই, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধিতে সে প্রেম ও রূপজমোহের ব্যবধানটা অল্পবয়সেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সে যেদিন শুনিল যে, সুকুমার বন্ধুর জন্য মেয়ে দেখিতে আসিয়া বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই তাহাকে বিবাহ করিতেছে, সেইদিনই সে যে ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়াছিল তাহার সে ভয় ও ঘৃণা আজও একেবারে যায় নাই। পুরুষের কলুষিত কামনার এই বীভৎস আত্মপ্রকাশে তাহার সমস্ত মন স্বামীর সম্বন্ধে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে সঙ্কোচ এখনও কাটে নাই। তাহার ধারণা ছিল যে, প্রথম তৃষ্ণা যখন মিটিবে, তখন তাহার স্বামী তাহাকে পুরাতন পাদুকার মতই ত্যাগ করিবেন। স্বামীর মনোরাজ্যে আর তাহার অধিকার থাকিবে না, পার্থিব রাজ্যে যদিবা থাকে!

অবশ্য, এতদিন ঘর করিতে করিতে স্বামীর রূপ, শিক্ষা, ভদ্রতা প্রভৃতি তাহাকে যে সুকুমারের দিকে মধ্যে মধ্যে আকৃষ্ট করে নাই তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মনকে আবার দৃঢ় করিয়াছে, নিজকে বুঝাইয়াছে—'এখনো সময় নহে!' তবু সে ছিল আকর্ষণের সন্দেহ—কিন্তু আজ, আজ মনে হইতেছে যে, পরাজয়ই বুঝি ঘটিয়াছে।

ইন্দিরা কিছুক্ষণ বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যে বয়স,

সে বয়সে মেয়েরা পুরুষের কাছে নিজকে নিঃশেষে নিবেদন করিতেই চায়, সুতরাং এই পরাজয়ের সংবাদটাও মনের উপর যেন একটা প্রথম-বসন্তের দখিনা হাওয়ার প্রলেপ বুলাইয়া দিল। সে ছিল ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া, সম্মুখের দর্পণে তাহার যে ছবি প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাতে লজ্জা, সুখ ও ভয়ের একটা মিলিত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাহাকেই মোহগ্রস্ত করিল।

কিন্তু সে অল্পক্ষণই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ইন্দিরা ওপাশের জানালাটার ধারে সরিয়া দাঁড়াইল। না, তাহাকে কঠিন হইতেই হইবে। এত সহজে এত শীঘ্র স্বামীর কাছে পরাজয় স্বীকার করা চলিবে না, সে পরাজয় যত সুখস্বপ্নই বহন করিয়া আসুক না কেন!

সে লজ্জা ও ভয়ের সমস্ত চিহ্ন মুখ হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার সহজভাবেই দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।......

ততক্ষণে ডাক্তার আসিয়া পৌছিয়াছেন। সুকুমারের জ্বর সামান্যই, ভয়ের কোন কারণ নাই—গায়ের ব্যথাও শীঘ্র আরাম হইবে, তিনি ভরসা দিয়া গেলেন। এখন সুধু একটু বিশ্রাম এবং লঘু পথ্য প্রয়োজন।

হরিপ্রিয়া সেদিন আর ছেলের শয্যাপার্শ্ব হইতে নড়িলেন না। সুকুমারের আকুল দৃষ্টি বার বার বৃথাই দ্বারপথের দিক হইতে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। ইন্দিরা বার দুই-তিন পথ্য বহন করিয়া আনিল বটে, কিন্তু সে মুহূর্ত কয়েকের জন্য। তা-ও তাহার মুখে এমনই একটা কাঠিন্যের আবরণ যে কাল রাত্রের স্বপ্নটা জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মিলাইয়া গিয়াছে, না, ইন্দিরার মনে কিছু ছাপ রাখিয়া গিয়াছে—তাহা বোঝা গেল না।

সন্ধ্যার দিকে সুকুমার বিরক্ত হইয়া উঠিল। প্রবোধবাবু ছেলের

মনোভাব বুঝিয়া গৃহিণীকে কহিলেন, তুমি এইবার একটু বিশ্রাম করতে গেলে না কেন! বৌমাকে না হয়—

হরিপ্রিয়া কঠিনকণ্ঠে শুধু কহিলেন, না।

সুকুমার কহিল, তুমি যাও না মা, আমি একলা বেশ থাকব। আমাকে একটু শান্তিতে ঘুমোতে দাও—

হরিপ্রিয়া অগত্যা জল, ঔষধ প্রভৃতি হাতের কাছে টেবিলের উপর গুছাইয়া রাখিয়া উঠিয়া গেলেন, কিন্তু তবু সুকুমারের উৎসুক চোখের প্রতীক্ষা বৃথাই হইল। ইন্দিরা আসিল না। হয়ত মা-ই নিষেধ করিয়াছেন—সুকুমার মনকে বোঝাইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু তবু মন অবসন্ন হইয়া আসিল!…কিছুই পাইল না সে, এ দুর্লভ ধন বুঝি কোন সাধনাতেই তাহার হস্তগত হইল না……

রাত্রেও হরিপ্রিয়া ছেলের ঘরেই রহিলেন। সুকুমারের বিরক্তিও তাঁহাকে কোমল করিতে পারিল না। তিনি ছেলের শিয়রে একটি ছোট বিছানা পাতিতে বলিয়া পাখা লইয়া সুকুমারের বিছানাতেই বসিলেন।

সুকুমার ক্ষীণকণ্ঠে একবার শুধু কহিল, তোমার আবার হার্ট ট্রাবল্‌স্ আছে, রাত জাগলে বাড়বে যে মা—

তুই কি পাগল হয়েছিস্ খোকা, রাত কে জাগ্‌ছে? একটু পরেই আমি এইখানটায় শোব—কিছু দরকার হ'লেই ডাকিস্।

অগত্যা ছেলে চোখ বুজিল। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল, কিন্তু খানিকটা পরেই সচকিত হইয়া উঠিল ইন্দিরার কণ্ঠস্বরে। সে চোখ খুলিয়া দেখিল, ইন্দিরা একটা বালিশ ও মাদুর লইয়া আসিয়া ঘরের ওপাশে মেঝের উপর শয়নের উদ্যোগ করিতেছে—

হরিপ্রিয়া কহিলেন, আমি তো আছি বৌমা, তুমি আবার অনর্থক কষ্ট ক'রতে এলে কেন?

ইন্দিরা শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, আপনার শরীর খারাপ মা, রাত্রে যদি কিছু দরকার হয়, আপনি কাঁহাতক্ কি করবেন! আমি রইলুম, দরকার হ'লেই আমাকে ডেকে দিবেন—

হরিপ্রিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া উঠিলেন, তা হ'লে না হয় তুমিই— অন্তত বীরুর মা'কে বললে না কেন মা, একটা বিছানা ক'রে দিয়ে যেতো—

কিচ্ছু দরকার নেই মা। এই বেশ থাক্‌ব—

সে শুইয়া পড়িল। বধুর এই দৃঢ় ইচ্ছাটিকে শাশুড়ী ইদানিং চিনিতে শুরু করিয়াছিলেন, অগত্যা তিনি চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু স্নকুমারের চিত্ত আবার উদ্বেল হইয়া উঠিল। এ কি শুধু শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধ, না তাহার সান্নিধ্য স্নকুমার একাগ্রচিত্তে কামনা করিতেছে জানিয়া, স্নকুমারের প্রতিই অনুগ্রহ? ইন্দিরার মুখের সেই পুরাতন ভাব-লেশহীন আবরণ দেখিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু আশা ও আশঙ্কায় সেদিনও সে অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিল না।

স্নকুমার তিন-চারদিনের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রথমদিনের স্বপ্ন স্বপ্নই রহিল, সে স্বপ্নের আবেশ ইন্দিরাকে স্পর্শ করিয়াছে কি না কিছুই বোঝা গেল না। সেবা-যত্নের ত্রুটি নাই সত্য কথা—বরং তাহার মধ্যে, অন্তত স্নকুমারের ব্যাকুল হৃদয় তাহাই মনে করে, আজকাল যেন একটু আন্তরিকতারই সুর বাজে। কিন্তু মুখের উপর তাহার তেমনি শান্ত কঠিন আবরণ। সে আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের কোন আগুনের সংবাদই আসিয়া পৌছে না।

হরিপ্রিয়া অবশ্য আর প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ান নাই, কিন্তু ইন্দিরা তাহার স্বতন্ত্র শয্যাই বহাল রাখিল। কিছুতে, কোনমতেই—স্নকুমারের শত আবেদনেও সে আর নিজের শয্যাতে ফিরিয়া গেল না। সুস্থ

হইয়া উঠিবার পর সুকুমার একদিন বলিতে গেল, এখন তো ভাল আছি বেশ, তবে আর অত দূরে থাকৃছ কেন ?

তাহাতে ইন্দিরা যেন একটু পরিহাসের ভাবেই জবাব দিল, ভাল আছ, সেটা বুঝি আর সহ্য হচ্ছে না। আবার রোগ বাড়াতে চাও ? ···তোমার সে সখ থাক্‌লেও আমাদের আর ভোগবার সখ নেই—

অগত্যা সুকুমার চুপ করিয়া গেল। বরং কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবিবার চেষ্টা করিল যে, তাহার পীড়ায় ইন্দিরা সত্যই চিন্তিত হইয়াছিল।······

দিন সাতেক পরে সুকুমার যখন আবার কলিকাতায় যাওয়ার কথাটা পাড়িতে গেল, তখন প্রবোধবাবু একেবারে বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, না। এখন ত নয়ই, আর যাবারই দরকার আছে কিনা তাই ভেবে দেখ্‌ছি।

সুকুমার মাথা নত করিয়া কহিল, সবটা পড়া রইল যখন, একটুর জন্য পরীক্ষাটা দেব না ?

দরকার কি ? তুমি ত আর ওকালতি করতে যাচ্ছ না ! জমিদারী চালানোর জন্য যেটুকু আইন জানা প্রয়োজন ছিল, তা-ত হয়েই গেছে—

আশ্চর্য্যের কথা এই যে সুকুমার আর কোন প্রতিবাদ করিল না। তাহার সেদিনের সে অদম্য জেদের যেন আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

সে চলিয়া যাইতেই প্রবোধবাবু সরকারকে ডাকিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন—সুকুমারের সমস্ত দেনা শোধ করিয়া বাসার জিনিসপত্র লইয়া যেন চলিয়া আসে, হোস্টেলে আর ঘর রাখিবার দরকার নাই। এবং সেদিন সন্ধ্যার সময় ইন্দিরা তাঁহার জলখাবার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই সংবাদটা তাহাকে দিলেন, মা-মণি, খোকা ত আবার কলকাতায় ফিরে যেতে চাইছিল,—

মুহূর্তের জন্য একটু উদ্বেগের ছায়া ইন্দিরার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

মৃদু হাসিয়া প্রবোধবাবু কহিলেন, ভয় নেই মা, আমি মানা

করেছি। শুধু তাই নয়, সরকারকে আজই পাঠিয়ে দিয়েছি কল্‌কাতাতে, ও-পাপ একেবারে চুকিয়ে দিয়ে আস্‌বে। বাসা থাকলেই আবার কোন দিন যেতে চাইবে। ওকে এখন দিনকতক একটু সাবধানে রাখা দরকার, বাইরেটা সারলেও শরীরের ভেতরটা সারেনি এখনও...কেমন যেন অবসন্ন হয়ে থাকে, না?

ইন্দিরা পাখাখানা হাতে করিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে জবাব দিল, দিনকতক একটু বাইরে গেলেই কিন্তু ভাল হ'তো হয়ত—

প্রবোধবাবু সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, ঠিক, ঠিক, ওকথাটা আমার মনেই হয়নি। একটু চেঞ্জে যাওয়াই দরকার ওর। ঠিক বলেছ মা—

তখনই তিনি গৃহিণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কহিলেন দেখ খোকাকে তা'হলে দিনকতক চেঞ্জেই পাঠিয়ে দিই, কি বলো?...... আমার ও কথাটা মনে ছিল না, মা-মণিই মনে করিয়ে দিলেন—

হরিপ্রিয়া যেন একটু বিস্মিতভাবেই লজ্জাবনতা বধুর দিকে চাহিলেন। তাহার পর কহিলেন, বেশ ত। কোথায় পাঠাতে চাও?

কেন, মধুপুর? বাড়ীটা ত পড়েই আছে—ঐখানেই যাক্ না!

হরিপ্রিয়া কহিলেন, সামনে গরম, সহ্য করতে পারবে?

প্রবোধবাবু জবাব দিলেন, খুব খুব! গরমের এখনো ঢের দেরি। তা-ছাড়া সেবার আমার অসুখের সময় মনে নেই, জ্যৈষ্ঠ মাসেই ছিলুম ত! কী আর এমন কষ্ট হ'তো—

হরিপ্রিয়া কহিলেন, তা হ'লে ঠাকুরমশাইকে বলো একটা দিন দেখে দিতে। কে কে যাবে?

প্রবোধবাবু মাথার পিছনটা বার-দুই চুল্‌কাইয়া কহিলেন, আমার আবার সাম্‌নে কিস্তি, এখন ত যাওয়া মুস্কিল।......অবশ্য দরকারও নেই বিশেষ—পুরোনো মালী রয়েছে সে-ই একা-একশ'। তা ছাড়া

এখান থেকে একটা ঝি, একটা চাকর নিয়ে গেলে আর তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

হরিপ্রিয়া কহিলেন, কিন্তু আমিই বা যাই কি ক'রে? অন্নপূর্ণা পূজো, তারপর সার-সার ব্রত আস্‌ছে—সে অগঙ্গার দেশে কি ক'রে কী করব? তুমিই যাও—

প্রবোধবাবু বিব্রতভাবে কহিলেন, তাই ত। তুমিও যেতে পারবে না, মা-মণি ছেলেমানুষ, একা—তাই ত!

হরিপ্রিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, মা-মণি তোমার পাকা গিন্নী!… তবে ওরাই যাক্। কটা দিনই বা—

প্রবোধবাবু উদ্বিগ্নভাবে আর একটা কি বলিতে গেলেন, হরিপ্রিয়া জোর করিয়া বলিলেন, সে জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। ওরা দু' জনেই যাক্—

৯০

এই ব্যাপারটা এতই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত যে, ইন্দিরা প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, কোন কথাই কহিতে পারে নাই। কিন্তু সে মূঢ় ভাবটা কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এ কী হইল, এ কেমন করিয়া হইবে! যেমন করিয়াই হউক, ইহা বন্ধ করিতে হইবে যে! সুকুমারেরই কল্যাণ-কামনায়, কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই, তাহাকে যখন একটু বাহিরে পাঠাইবার কথা বলিয়াছিল, তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে এই জাঁতিকলে সে নিজেই ধরা পড়িবে! সে যে মনে মনে একটু দুর্বল হইয়াই পড়িয়াছে, একথা আজ আর নিজের কাছে, অন্তত স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। যেটুকু সন্দেহ ছিল এতদিন

আজ স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য তাহার এই উদ্বেগেই দূর হইয়া গেল। এক্ষেত্রে একা দীর্ঘদিন বিদেশে শুধু স্বামীর সহিত ঘর করা ভীষণ বিপজ্জনক যে!

অবশ্য ইহাতে এমন যে কী ক্ষতি হইবে তাহা ইন্দিরার পক্ষে সেদিন কাহাকেও বোঝানো কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছিল তাহার কাছে কতকটা জেদের মত; এখন কোনমতে, কোন কারণেই সুকুমারের কাছে ধরা দেওয়া যেন তাহার পক্ষে বিষম লজ্জার কথা! এক প্রকারের নেশাতে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল যেন, আঘাত ফিরিয়া আসিয়া নিজের বুকে বাজা সত্ত্বেও সে-আঘাত করার নেশা সে তাই ছাড়িতে পারিতেছিল না।…

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় হরিপ্রিয়ার কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে কহিল, মা আমি একা যেতে পারবো না।—

একা কেন যাবে মা, মোক্ষদা যাবে, সুন্দর যাবে, সেখানে মালী আছে! ডাক্তার-বদ্যিরও অভাব নেই সেখানে, ভয় কি?

ইন্দিরা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, কিন্তু আপনি সঙ্গে না থাকলে আমার ভরসা হয় না যে!

দূর পাগ্‌লী! হরিপ্রিয়া হাসিয়া কহিলেন, এতদিন দায়িত্ব আমার ছিল, আমি বয়েছি। এখন এ ভার তোমার যে মা, এখন আমার চেয়ে মাথা ব্যথা তোমার ঢের বেশী।…কিছু ভয় নেই, খোকা আমার এমন কিছু অসহায় হয়ে পড়েনি ত! এমনি একটু সময়ে ভাত-জলটা যাতে পায়, তাই শুধু লক্ষ্য করা। এ আর পারবে না? খুব পারবে!

ইন্দিরার মাথা আরও নত হইয়া আসিল, সে কহিল, বড্ড ভয় করে মা। আমি ত কখনও বাইরে কোথাও যাইনি। একা, কী করব তাই ভাবি—

বিদেশ হ'লেও সে-ও তোমারই বাড়ী যে মা। ভয় কি!…আমি

কি আর চিরকাল থাকব? তোমার সংসার, তুমি বুঝে পড়ে নাও আস্তে আস্তে!

ইন্দিরা ইহার আর কোন জবাব খুঁজিয়া পাইল না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া এক সময়ে উঠিয়া গেল।

'সেজ'-এর প্রায়ান্ধকার আলোকে হরিপ্রিয়ার মুখ দেখা গেল না তাই, নহিলে ইন্দিরা লক্ষ্য করিত, সে মুখে অর্থপূর্ণ একটা হাসি। ছেলের দুঃখ দূর করার উপায় এতদিনে তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন!...

সুকুমার কিন্তু কথাটা শুনিয়া প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করিতে পারিল না। সে আর ইন্দিরা শুধু থাকিবে! নিভৃতে, নির্জনে—তাহাদের সেই বিস্তৃত গোলাপ বাগানের মধ্যে? স্বপ্ন বটে, কিন্তু এ স্বপ্ন আনন্দের সহিত অনেকখানি বেদনাও বহন করিয়া আনিল। এখানে যে দুঃখ তাহাকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দিতেছে, সেখানে কি তাহা আরও অসহ্য হইয়া উঠিবে না?...

সে একবার শুষ্ক স্বরে প্রবোধবাবুকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, দরকার কি ছিল বাবা, আমি এখানেই বেশ সেরে উঠ্তুম। মিছি-মিছি হাঙ্গামা—

প্রবোধবাবু হাসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, না রে পাগলা; মিছিমিছি নয়। আমার মা-মণি কোন কথা না ভেবে বলেন না। তিনি যখন বলেছেন যে তোর বাইরে যাওয়া দরকার, তখন আর কোন কথাই নেই। তাছাড়া, আমিও ভেবে দেখলুম যে মাসখানেক ওখানে কাটিয়ে আসতে পারলে আর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না—'শক্'-টা ত কম গেল না!

ইন্দিরা বলিয়াছে বাহিরে যাওয়ার কথা! তাহা হইলে এ ব্যবস্থা তাহার? তবে...তবে কি এই একা যাওয়ার প্রস্তাবও ইন্দিরারই?

বহুদিনের বন্ধ ঘরের ভিতর দিয়া যেন এক ঝল্‌ক দখিনা বাতাস বহিয়া গেল। সে যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি নির্মল। অত্যধিক সুখের

আশাতেই যেন তাহার মাথার স্নায়ুগুলি দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল। সে ক্লান্তভাবে নিজের শয়নগৃহের সামনের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িল—

অনেকক্ষণ পরে, রাত্রি তখন গভীর হইয়া আসিয়াছে, ইন্দিরা আসিয়া দাঁড়াইল। যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ-কণ্ঠে, যেন অন্যদিকের থামকে উদ্দেশ করিয়াই কহিল, তোমার কি কি নিতে হবে, বললে ভাল হ'তো। ঠাকুরমশাই পাঁজি দেখেছেন, কাল ছাড়া নাকি সাতদিন আর যাত্রা নেই, মা বলছেন কালকেই—

ইন্দিরার কণ্ঠে যতই নিরাসক্তি থাক্, এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রস্তাবেও সুকুমার তাহারই কিছু কৌশল কল্পনা করিল। ফলে তাহার বুকে বহুদিনের জমাটবাঁধা প্রেম গলিয়া যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে গাঢ় কণ্ঠে কহিল, আমার যে কী চাই তা ত আমি ভুলেই গিয়েছি ইন্দু, আমার সব কিছু ভাল-মন্দ, চাওয়া-পাওয়া, সবইত নিঃশেষে তোমাকে সঁপে দিয়েছি। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই নেবে—

ইন্দিরা মনকে যতটা সম্ভব উদাসীন ও কঠিন করিয়াই আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ সুকুমারের এই করুণ কণ্ঠ তাহার মনকেও প্রবলভাবে একটা নাড়া দিয়া গেল, তাহার গলার কাছে যেন কী একটা ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে মুহূর্ত-দুই সহজভাবে কথা কহিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া দ্রুতবেগে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সুকুমার তাহার অপসরণ প্রথমটা লক্ষ্য করে নাই, নিজের চিত্তের মাধুর্য-রসে নিজেই বিভোর হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার পর আরও কি একটা বলিতে গিয়া যখন লক্ষ্য করিল, তখনও এই অপসৃতিকে লজ্জা বলিয়াই মনে করিয়া অধিকতর স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল।

ইন্দিরা সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। স্বামীর

কাছে সে যে ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এত সহজে সে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিবে না! কিছুতেই না। এত কাণ্ডের পর এমনভাবে ধরা দিলে আর কোন দিনই স্বামীর কাছে নিজকে উঁচু করিয়া রাখিতে পারিবে না।

না না, সে বড় লজ্জার কথা! সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, মধুপুরে গিয়া নিজকে সে স্বামীর কাছ হইতে প্রাণপণে দূরে রাখিবে। নহিলে আর রক্ষা নাই। যতদিন নিজের মন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল, যতদিন সুকুমার ছিল পরস্যাপি পর, ততদিন সে স্বাভাবিকভাবেই তাহার পরিচর্য্যা করিয়া গিয়াছে—কিন্তু এখন আর তাহা চলিবে না। দৈহিক ব্যবধানকে যতটা সম্ভব বিস্তৃত করিয়া তুলিতেই হইবে।

১১

গুরুজনদের আশীর্বাদ মাথায় লইয়া পরদিন সুকুমার বেশ প্রফুল্ল মনেই যাত্রা করিল। তাহাদের জন্য সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট করা হইয়াছিল, দাসী-চাকর ছিল অন্য কামরায়। একটার প্যাসেঞ্জার ট্রেণ মন্থরগতিতে যাইবে, পৌঁছিবে প্রায় সন্ধ্যার সময়, যদিও 'ফাস্ট প্যাসেঞ্জার' নাম। ইহার আগেই দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ছিল কিন্তু ভিড়ের অছিলায় সুকুমার তাহা কাটাইয়া দিয়াছিল, ইন্দিরার সহিত একা ট্রেণযাত্রার অপূর্ব অভিজ্ঞতাটা সে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুভব করিতে চায়।

তাহারা যখন উঠিল তখন গাড়ি একেবারে খালি। চাকর বিছানা পাতিয়া বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছিল, দু'জনে পাশাপাশিই বসিল। কিন্তু চাকর নামিয়া যাইতেই ইন্দিরা সুকুমারের দিকে একেবারে পিছন ফিরিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুকুমার ইহাতে ঈষৎ ব্যথিত হইল সত্য কিন্তু তাহার এই কয়দিনের অভিজ্ঞতাতেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে জোর করিয়া, টানাটানি করিয়া কিছুই মিলিবার সম্ভাবনা নাই। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে ইহা লজ্জা, ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইবার অবসর দিতে হইবে।

ইন্দিরা পাশ ফিরিয়া বসিল বটে কিন্তু নির্জন গাড়ির মধ্যে এই সান্নিধ্য তাহারও বক্ষ-স্পন্দন বাড়াইয়া দিয়াছিল। আশ্চর্য্য, কিছুদিন আগে ইহার অপেক্ষাও নির্জন সান্নিধ্য তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

কিন্তু আজ তাহার বুক, যেন কোন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায়, ঢিপ্-ঢিপ্ করিতেছিল। তাহার জীবনে এই প্রথম বিদেশযাত্রা, বাহিরের ক্রমাগত এবং ক্রমবিলীয়মান ঘাট-মাঠ-প্রান্তর-পল্লী তাহার দৃষ্টির সম্মুখে এক অভূত-পূর্ব বিস্ময়ের রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে। সেই অনাস্বাদিত অনুভূতিতে তাহার আনন্দে মাতিয়া উঠিবার কথা, কিন্তু সে সেদিকে ভাল করিয়া মন দিতেও পারিল না, পিছনের একটি দুর্বল, সহনশীল, অপরাধী মানুষের উপস্থিতি তাহার সমগ্র মনকে সেদিন যেন ভীত, জড় করিয়া তুলিয়াছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সুকুমার একটি সহজ প্রশ্নে সেই অসহ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, তুমি এর আগে আর এদিকে কখনো আসোনি, না?

ইন্দিরা যেন চমকিয়া উঠিল। তাহার পর মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সুকুমার আবার প্রশ্ন করিল, এদিকে তোমার কোন আত্মীয়ের বাড়ী নেই? কখনও আসবার দরকার হয়নি?

এবার ইন্দিরা কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া জবাব দিল, তেমন কোন

আত্মীয়ের কথা কখনও শুনিনি। তা ছাড়া, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নেবার মত অবস্থা ত বাবার ছিল না!

সুকুমার লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল!

খানিক পরে ইন্দিরাই কথা কহিল, অনেকক্ষণ একভাবে বসে রয়েছ, তুমি না হয় শোও, আমি ওধারে গিয়ে বসছি—

সুকুমার প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, না, আমি এখন শোবো না। তুমি এখানেই ব'সো। যদিও তুমি বিরূপ, তবু ত কাছে আছো!

ইতিমধ্যে শ্রীরামপুর স্টেশন আসিয়া পড়িল। একটি ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও একটি শিশুকন্যা লইয়া তাহাদের গাড়িতেই উঠিলেন। বছরখানেকের মেয়ে, ফুটফুটে, মোটাসোটা, দেখিলেই আদর করিতে ইচ্ছা করে। মেয়েটিও, কে জানে কেন, ইন্দিরার আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়াই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক—গাড়িতে উঠিয়াই ইন্দিরার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। ইন্দিরা প্রথমটা একটু বিস্মিত হইয়া মুহূর্তখানেক বোধ হয় ইতস্তত করিল, তাহার পর মেয়েটিকে সস্নেহে এবং সযত্নে কোলে টানিয়া লইল! মেয়েটির বাবা প্রসন্ন ও অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে চাহিলেন, তাঁহার স্ত্রীও ঈষৎ লজ্জিত ভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মেয়েটি অত্যন্ত চঞ্চল। প্রথমটা সে ইন্দিরার আদর বেশ প্রশান্ত-ভাবেই সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু একটু পরেই এমন অস্থির হইয়া উঠিল যে, ইন্দিরার ছোট ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে স্বাভাবিক প্রীতি ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, যেন বিব্রত হইয়া পড়িল। মেয়ের মা ব্যাপার দেখিয়া হাত বাড়াইয়া কহিলেন, দিন্ ভাই আমার কাছে, বড্ড জ্বালাতন করছে আপনাকে।

ইন্দিরা সবেগে খুকীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, থাক্ আমার কাছেই। এ আমার অভ্যাস আছে—

ভদ্রমহিলা যেন ঈষৎ বিস্মিতভাবে দু'জনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ভাইবোন্ আছে বুঝি অনেক ?

মেয়েটা ততক্ষণে ইন্দিরার রেশমের মত নরম কালো চুল মুঠা করিয়া ধরিয়াছে ; আস্তে আস্তে তাহার মুঠি খুলিতে খুলিতে ইন্দিরা জবাব দিল হ্যাঁ—সাতটি !

ইহার পর আলাপ জমিয়া উঠিল। স্বামীর সহিত স্বামীর সামান্য দু-একটি বাক্যবিনিময় হইল, কিন্তু স্ত্রী দুইজন নিম্নস্বরে দ্রুত গল্প জমাইয়া তুলিলেন। ভদ্রলোক যাইবেন বর্ধমান, সেখানেই তিনি কাজ করেন, শ্বশুরবাড়ি হইতে স্ত্রীকে লইতে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের বয়স একটু বেশী হইলেও ইনিই প্রথম পক্ষ এবং এইটিই প্রথম সন্তান।

বৌটি চুপি চুপি কহিলেন, বাস্তবিক আপনাদের কী চমৎকার জোড় মিলেছে, দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। সাধরণত হয় স্বামী সুন্দর ত স্ত্রী কুচ্ছিত, আর স্ত্রী সুন্দর ত স্বামী একেবারে লোহার কার্তিক। উনি ওধারের খালি গাড়ীতে উঠছিলেন, আমিই ভাই আপনাকে দেখে এই গাড়িতে উঠতে বললুম। তবু দু'দণ্ড ত চোখে দেখতে পাবো—

ইন্দিরার মুখে যেন কে সিন্দুর ঢালিয়া দিল। সে মাথা নত করিয়া খুকীকে আদর করিতে লাগিল, কথা কহিল না।

খুকীর বাবাও তখন সুকুমারকে চুপি চুপি বলিতেছিলেন,' বাস্তবিক আপনাদের যেমন মিলেছে এমন কদাচিৎ দেখা যায়। আপনারা দু'জনেই পূর্বজন্মে দু'জনের জন্যে তপস্যা করেছিলেন।

সুকুমারের মুখ আনন্দ-বেদনায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল, সে আড়ে চাহিয়া দেখিল ইন্দিরার মাথা আরও নত হইয়া পড়িয়াছে—

ইতিমধ্যে ব্যাণ্ডেল স্টেশন আসিয়া পড়িল। খুকী ইন্দিরার হারের মুক্তাখচিত খামিখানা লইয়া খেলা করিতেছিল, তখন সেটা ফেলিয়া প্ল্যাটফর্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। খাবারওয়ালা, পাখাওয়ালা, চা-ওয়ালা

যে যায় তাহাকেই হাতছানি দিয়া ডাকে এবং নামিয়া যাইতে চায়। ইন্দিরা প্রাণপণে তাহাকে সামলাইতে লাগিল, বিব্রত হওয়া সত্ত্বেও কাহারও কোলে দিল না।

কিন্তু অবস্থা চরমে পৌঁছিল পুতুলওয়ালা দেখা দিতে। মেয়েটি আর কোন কথাই শুনিতে চাহে না, দুর্বার হইয়া ওঠে। খেলনাওয়ালা ইন্দিরার বেশভূষা ও মেয়েটির রকম দেখিয়া সুবিধাজনক খরিদ্দার বুঝিয়া একেবারে জানলার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটা ঝুমঝুমি তুলিয়া প্রাণপণে বাজাইতে লাগিল।

ইন্দিরা বিষম অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। তাহার টাকার দরকার হইতে পারে এ খেয়াল তাহার ছিলই না কখনো। বাপের বাড়িতে কিছুই পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, এখানে আসিয়া না চাহিতেই সব জিনিস পায়—সুতরাং কাছে তাহার টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। শ্বশুর অবশ্য তাহাকে এই তিনমাসে হাতখরচ বলিয়া কয়েক টাকা করিয়া দিয়াছেন কিন্তু সে তেমনি আল্‌মারীতেই পড়িয়া আছে, কোনদিনই তাহার দরকার পড়ে নাই। অথচ এখন এমন অবস্থা যে অন্তত একটা কিছু না কিনিলে মান থাকে না—।

সে মুহূর্ত-দুই ইতস্তত করিয়া লজ্জারক্তিম মুখ তুলিয়া অবশেষে বিপন্ননেত্রে সুকুমারের দিকেই চাহিল। সুকুমার নিমিষে অবস্থাটা কল্পনা করিয়া লইয়া একেবারে সরিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল; কহিল, নাও না, কী নেবে নাও—এই খেলনাওয়ালা, ঐ বাঁশিটা দেখি—

তাহার পর সে প্রায় তাহার ডালা উজাড় করিয়া খুকীর জন্য খেলনা কিনিল। পুতুল, বাঁশি, ঝুমঝুমি, বেলুন—আরও কত তাহার ইয়ত্তা নাই। খুকীর বাবা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, মা অনুযোগ করিতে লাগিলেন—'এ অন্যায়' 'অত্যন্ত অশোভন' ইত্যাদি বলিয়া—কিন্তু সুকুমার কোন কথাই শুনিল না। ইন্দিরা এই প্রথম তাহার কাছে কিছু

চাহিয়াছে, হউক্ সে পরের জন্য, কিন্তু তবু ত চাহিয়াছে ! সে আনন্দে দিশাহারা হইয়া খেলনার পর খেলনা বাছিয়া লইতে লাগিল। আরও তিন ডালা পাইলে সে বোধকরি কিনিত।......

ব্যাণ্ডেল হইতে ট্রেন ছাড়িল ! মেয়েটির বাবা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, এ কি করলেন বলুন দেখি !

সুকুমার কহিল, তাতে কি হয়েছে ! কয়েকটা পুতুল কিনেছি বৈ ত নয়—

মেয়ের মা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, এখন সারতে যাচ্ছেন যান—ফেরবার পথে কিন্তু একবার কর্তাকে নিয়ে বর্ধমানে নামতে হবে। বলুন যাবেন—আমাকে কথা দিতে হবে, নইলে ছাড়ছি না !

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। কে জানে কেন তাহার তখন দুই চোখ ভরিয়া জল আসিয়াছিল, সে কথা কহিল না।...

ভদ্রলোকেরা আরও বহু আপ্যায়নের পর বর্ধমানে নামিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে মেয়েটি ইন্দিরাকে দুই বাহু দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, ফলে তাহার মনটা ভার হইয়াই রহিল, ঐ অপরিচিতা ক্ষুদ্র মানবিকা অকস্মাৎ যেন তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সুকুমার মৃদু কণ্ঠে পিছন হইতে বলিল, তোমার কোলে ওকে যে কী চমৎকার দেখাচ্ছিল কি বলব ! ভারী সুন্দর মানিয়েছিল কিন্তু—

ইন্দিরার মাথা আরও একটু নত হইল। কিন্তু সে লজ্জিতই হইল শুধু, রাগ করিল না !

১২

মধুপুর স্টেশনে গাড়ি পৌঁছিল সন্ধ্যার কিছু পূর্বে। মালী স্টেশনে উপস্থিত ছিল, সে ঠাকুর-চাকরের সাহায্যে মালপত্রের তদারক করিতে লাগিল, স্থকুমার ইন্দিরাকে লইয়া একটা ছোট খোলা গাড়িতে চাপিয়া বাড়ির দিকে রওনা হইল।

নূতন দেশ, খেলাঘরের মত গাড়ি, সমস্তটা জড়াইয়া ইন্দিরার অদ্ভুত লাগিতেছিল। প্রথম বসন্তের ঈষৎ শীত-মেশানো মধুর হাওয়া উঁচু গাছগুলির উপর দিয়া সর্‌সর্‌ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, চারিদিকের ফুলবাগান হইতে অসংখ্য বেল-গোলাপের গন্ধ, দূরের একটা মহুয়াগাছের গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া কেমন যেন মোহের সৃষ্টি করে। ইন্দিরাও কোন্‌ এক অজ্ঞাত পুলকানুভূতিতে শিহরিয়া উঠিল।...

তখন অধিকাংশ বাড়ীরই বাবুর দল হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এই স্থন্দর দম্পতিটির দিকে অবাক নয়নে চাহিতেছিলেন এবং আপোষে মৃদু সমালোচনা করিতেছিলেন।

স্থকুমার রকম দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, তোমাকে দেখে এদের সকলকারই মাথা ঘুরে গেছে, তা দেখ্‌ছ—?

ইন্দিরা আরক্তমুখে একটু ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। কিন্তু মোটের উপর এই সব অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা তাহার ভালই লাগিতেছিল।

যাহা হউক্‌—কালীপুর টাউনের প্রান্তে স্থকুমারদের বাড়ি, সেখানে পৌঁছিতে বেশী সময় লাগিল না। মালী-বৌ আসিয়া তাড়াতাড়ি ফটক্‌ খুলিয়া দাঁড়াইল।

স্থকুমার গাড়ি হইতে নামিয়া হাত ধরিয়া ইন্দিরাকে নামাইতেছে, এমন সময় দূর হইতে এক বাঙালী সাহেব উচ্চকণ্ঠে "হ্যাল্লো, স্থকুমার

না!” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সুকুমার বিস্মিতভাবে ফিরিয়া দেখিল—তাহার স্কুল-জীবনের বন্ধু আনন্দ। ছেলেটি বড়লোকের ছেলে এবং বরাবরই একটু সাহেবীভাবাপন্ন, তবু সুকুমার তাহাকে পছন্দই করিত। অনেকদিন পরে একজন বন্ধুকে পাইয়া তাহারও মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আনন্দ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া কাছে আসিয়া একেবারে সুকুমারকে জড়াইয়া ধরিল, কহিল, মাই গুডনেস্, মিসেস সুদ্ধ হাজির দেখ্ছি যে! জাস্ট ইন্ট্রোডিউস্ মি, ওল্ড ফেলো!

সুকুমার যথারীতি তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিল,—আমার বন্ধু আনন্দ মুখার্জ্জি—আমার স্ত্রী ইন্দিরা দেবী।

তাহার পর ইংরেজীতে আনন্দকে কহিল, তোমার ইংরেজীটা কমাও, উনি একবর্ণও জানেন না। বিব্রত বোধ করবেন—

আনন্দ আর এক দফা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, সো লাকী! এই দু'বৎসর, বিলেত থেকে ফিরে এসে অবধি, বিলিতি বাঙালীদের মধ্যে থেকে ডিসগাস্টেড হয়ে উঠেছি। এখানে এসেছি বলতে গেলে নির্জন বাসের জন্যে। ভালই হ'লো তোদের পেলুম! বৌদি, এ অধম দেওর আপনাকে জ্বালাবে কিন্তু মধ্যে মধ্যে এসে, তখন মোদ্দা রাগ করতে পারবেন না। এক-আধ দিন আপনার শ্রীহস্তের চা-ও খেয়ে যাবো। এখানে চাকরের ভরসায় আছি, বুঝতেই ত পারছেন—চায়ে অরুচি ধরে যাবার উপক্রম হ'লো—

ইন্দিরা নতমুখে অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিল, এখনই আসুন না, চা ক'রে দিচ্ছি।

তাহার পর মালী-বৌয়ের অনুসরণ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

আনন্দ পিছন হইতে উচ্চকণ্ঠে কহিল, একবারে অতটা প্রশ্রয় দেবেন না বৌদি, তাহ'লে আর নড়ব না—

তাহার পর সুকুমারের পিঠে একটা চাপড় মারিয়া কহিল, মাই গুডনেস্ এঁকে তুই অশিক্ষিতা বলছিলি? এ ত দিব্যি ফরওয়ার্ড—

পত্নীগর্বে সুকুমারের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, অশিক্ষিতা, তাছাড়া একেবারে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অজ পাড়া-গাঁ যাকে বলে—

আনন্দ বিস্ময়ে শীষ্ দিয়া উঠিল। বলিল, বলিস্কি? স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি! রূপে, গুণে—যাকে বলে স্ত্রীরত্ন। পাড়াগাঁয়ের হ'লো ত কি হ'লো? বালিগঞ্জে ত তুইও কম যাসনি, আমার ত না হয় অরুচি ধরে গেছে—এমন ত সেখানেও নজরে পড়ে না—

সুকুমার কহিল, সে কথা থাক্—এখন চল্ ভেতরে—চা খেয়ে যাবি—

দুজনে গল্প করিতে করিতে ভিতরে আসিয়া বসিল। ততক্ষণ মাল-পত্র লইয়া ভৃত্যের দল আসিয়া পৌছিয়াছে। উনুন ধরানোই ছিল, ইন্দিরা চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া বাথরুমে চলিয়া গেল।

চা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা হইতে আনীত বিস্কুট, সন্দেশ এবং চা একটা থালায় সাজাইয়া লইয়া ইন্দিরা যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার দিকে চাহিয়া আনন্দের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আগেকার সিল্কের শাড়ি আর নাই, সামান্য একখানা আস্মানী ও সাদায় শান্তিপুরে ডুরে মাত্র পরণে, অলঙ্কারেরও কোথাও বাহুল্য নাই—অথচ রূপ যেন জ্বলিতেছে, সেদিকে চাহিলে চোখ ধাঁধিয়া যায়!

মাথার কাপড় সামান্য একটু কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই মধ্য হইতে সুন্দর শুভ্র ললাটের যেটুকু আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহার দীপ্তি অসামান্য। তাহার সেই ঈষৎ স্বেদবিজড়িত, লজ্জারক্ত, আনত মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দ অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, গুডনেস্ গ্রেসাস্—আই এন্‌ভি ইউ, ওলড্ বয়!

ইন্দিরা কথাগুলার শব্দার্থ না বুঝিলেও ভাবার্থটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল, ফলে তাহার মুখ আরও নত হইয়া গেল।

সে কোন মতে তাহাদের সামনে টেবিলের উপর চা ও খাবার সাজাইয়া দিয়া যখন চলিয়া যাইতেছে, তখন আনন্দের চমক ভাঙ্গিল, বৌদি, আপনি খাবেন না?

অর্ধস্ফুটস্বরে ইন্দিরা জবাব দিল, আমার বিশেষ চা খাওয়ার অভ্যাস নেই, আপনারা খান—

আনন্দ ব্যস্ত হইয়া কহিল, তা আপনি একটু বসুন অন্তত, খাবেনও না, আমাদের সঙ্গে বসবেনও না—এমন ক'রে চলে কি ক'রে? বসুন, বসুন—

ইন্দিরা বিপন্নমুখে একবার সুকুমারের দিকে চাহিল, দেখিল তাহার মুখে কৌতুকের হাসি—তখন অগত্যা খানিকটা দূরে একটা 'সেটি'র উপর বসিয়া পড়িল।

চায়ের বাটিতে তাড়াতাড়ি একটা চুমুক দিয়া আনন্দ কহিল, আঃ—ডিলিসাস্—আপনি ত চা খান্ না, তবে এমন সুন্দর চা করতে কেমন ক'রে শিখলেন?

ইন্দিরা মৃদু হাসিল, কথার জবাব দিল না।

আনন্দ, তাহার দৃষ্টি ও রসনা এতদিন পরে অভাবনীয়ভাবে তৃপ্ত হওয়ার আনন্দে, অনর্গল বকিয়া চলিল। সুকুমারও বন্ধুকে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গিয়াছে, বহুদিন পরে তাহারও মনের একদিককার রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গিয়াছে, সে-ও হাসিখুশীতে ভরপুর হইয়া উঠিল। আর ইন্দিরারও এই প্রগল্ভ, প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে মন্দ লাগিতেছিল না, সে চুপ করিয়া বসিয়া দুই বন্ধুর হাস্য-পরিহাসবিজড়িত কথাবার্তা শুনিতেছিল এবং অপেক্ষা করিতেছিল চায়ের পর্ব শেষ হওয়ার।

কিন্তু সহসা তাহার সুখস্বপ্ন যেন এক রূঢ় আঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল।

তাহার কানে গেল, আনন্দ বলিতেছে, আমাদের সেই সতীশকে মনে আছে তোর? সে-ত কলেজেও তোর সঙ্গে পড়েছিল। বহুদিন পরে তার সঙ্গে সেদিন হঠাৎ দেখা। আমার দিদিরা শিমুলতলায় এসে রয়েছেন কিনা পূজোর সময় থেকেই, গত রবিবার আমিও গিয়েছিলুম ওখানে, তাঁদের দেখতে। ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে বাজারে বেরিয়েছি—সতীশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও-নাকি জলপাইগুড়িতে কি এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অর্গানাইজার হয়ে গিয়েছিল। শরীর খারাপ হ'তে মাস-দুইয়ের ছুটি নিয়ে ওখানে এসে আছে।...বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে দেখলাম, তবে শরীরের চেয়ে দেখলাম মনই ওর বেশী খারাপ। সে-এক মজার ব্যাপার, বুঝলি সুকুমার, ওর নাকি কোন এক মেয়েকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছিল, তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে—তার পর হঠাৎ ওর সম্বন্ধে মেয়েদের কানে কি সব কথা গিয়ে পৌঁছয়, ও-নাকি মদ্ খায়, ও চরিত্রহীন, ওর কুলেও কি গোলমাল আছে—এই সব। মেয়ের বাপ ওকে তখন, যাকে বলে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট, তাই দেখাতে বলেন, অর্থাৎ ও-যে সৎপাত্র, তারই একটা প্রমাণ চান; তার ফলে ওর সঙ্গে একটু বচসা হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। ও মনের দুঃখে চাকরী নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গিয়েছিল।...

একটু থামিয়া একটা পাইপ ধরাইতে ধরাইতে আনন্দ আবার বলিল, কিন্তু মেয়েটি ওকে পেয়ে বসেছিল, তাই মাসখানেক পরে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে আবার ফিরে এল বেচারী, কিন্তু সে মেয়ে ততদিনে আর কোন্ ভাগ্যবানের গলায় মালা দিয়ে তারই ঘর করতে চলে গেছে—তার আর পাত্তা মিল্‌ল না। সেই দুঃখ বেচারী আজও ভুলতে পারে নি—বুঝলি না, হাঃ, হাঃ, হাঃ—

নিজের বলার ঝোঁকে আনন্দ এতক্ষণ অনর্গল বকিয়া গিয়াছিল, সহসা এখন মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল সুকুমারের

মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ইন্দিরাও আরক্ত মুখে উঠিয়া ভিতরে চলিয়া যাইতেছে।

সে ঈষৎ ভীতকণ্ঠে কহিল, কি হ'লো রে তোর, অসুখ-বিসুখ করছে না কি?

সুকুমার কোনমতে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

কিন্তু বৌদিই-বা অমন ক'রে বেরিয়ে গেলেন কেন? আমার এই গল্পে কিছু গোলমাল হ'লো নাকি? উনি চিনতেন নাকি সতীশকে?

সুকুমার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, ওঁর সঙ্গেই আগে সতীশের বিয়ের কথা হয়েছিল—

মাই গড্— এ যে একেবারে নাটক!…তারপর ওঁর সঙ্গে পূর্বরাগ, অনুরাগ কিছু—?

না, না! উনি দেখেনই নি তাকে ভাল ক'রে।

তা হ'লে উনি অমন ক'রে উঠে গেলেন কেন? এর ভেতরে তোর কোন হাত ছিল নাকি?

ঈষৎ বিরক্তকণ্ঠে সুকুমার কহিল, এর ভেতরে হাত থাকবার কি আছে! ও বিয়ে করলে না, গোলমাল হ'লো, ওরা ত অন্য পাত্রে দিতই, না হয় আমি করেছি।…

সো সরি—কিছু মনে করিস্ নি।…এখন দেখ্ছি প্রসঙ্গটা না উঠলে ভাল হ'তো। বৌদিও বোধহয় বিরক্ত হলেন—ছি, ছি!

সুকুমার কহিল, না, না। সে এমন কিছু নয়। তবে ও সম্বন্ধে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো—

এই সময়ে পর্দা সরাইয়া আবার ইন্দিরা দেখা দিল। সে ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল। তাহার মুখ একেবারে ভাবলেশহীন, সে-মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সে নতমুখে অন্যদিকে চাহিয়া কহিল, আপনি তা হ'লে রাত্রে খেয়ে

যাবেন। আপনার বাসাটা আমাদের মালীকে বুঝিয়ে দিলে ও আপনার চাকরকে খবর দিয়ে আসতে পারে—

আনন্দ ঈষৎ যেন বিব্রত হইয়া উঠিল। কহিল, চাকরকে খবর না দিলেও চল্‌বে কিন্তু আজই কেন বৌদি, সবে আপনারা এলেন, নতুন ঘর-কান্না—একটু গুছিয়ে নিলে ভাল হ'তো না? কাল-পরশু একদিন যখন হোক—

ইন্দিরা মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

তাহার পর আবার ভিতরে চলিয়া গেল।

আনন্দ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যাক বাবা, দেবী রুষ্টা হন্‌নি বোঝা গেল। কি বলিস?

কিন্তু সুকুমার জবাব দিল না। ইন্দিরার মুখের এই চেহারাটা সে চিনিত।

ইহার পর রাত্রের আহারাদি পর্ব পর্য্যন্ত বেশ সহজভাবেই কাটিল। কিন্তু ইন্দিরার এই কয়েকদিনের ব্যবহারে এবং ট্রেনের ব্যাপারে সুকুমারের মনে যেটুকু আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সেটুকুর যেন আর চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। অপরাহ্নের সেই কুৎসিত ও বেদনাময় কথাগুলির পর, কে জানে কেন, কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল যে ইহার পর তাহার ও ইন্দিরার মধ্যেকার ব্যবধান আরও বাড়িয়া যাইবে। তাহার যে আচরণটা ইন্দিরা একটু একটু করিয়া ভুলিতে শুরু করিয়াছিল তাহারই স্মৃতি আজ আবার নূতন করিয়া ব্যবধান রচনা করিয়া দিয়া গেল।

হইলও তাহাই—

আনন্দ বিদায় হইলে ক্লান্ত সুকুমার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যে-দুইটা তক্তাপোষ ঘরের মধ্যে জোড়া দিয়া ইতিপূর্বে বিছানা করা হইত তাহাদেরই দুই পাশে সরাইয়া দুইটি ভিন্ন শয্যা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সে মুহূর্ত-দুই স্তম্ভিতভাবে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। আশা হয়ত ছিলই না, কিন্তু আশার অতীত আশাও মানুষ কখনো কখনো করে—আর, বোধ হয় সে আশা একেবারে কখনই তাহার মন হইতে মুছিয়া যায় না। সুকুমারও তাহার মনের প্রচ্ছন্ন অন্তঃপুরে কোথায় একটা আশা পোষণ করিয়াছিল যে, প্রকাশ্য বিদ্রোহ আর ইন্দিরা করিবে না। কিন্তু—

ইন্দিরা ওপাশের একটা জানালার রেলিং ধরিয়া স্তব্ধভাবে বাহিরের বাগানের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বোধ হয় সে সুকুমারের নিকট হইতে কিছু অনুযোগই আশা করিতেছিল, কিন্তু সুকুমার কোন কথাই কহিল না, দীর্ঘনিঃশ্বাসটাও চাপিয়া বিছানায় আসিয়া বসিল। এই কয়দিনে সে বুঝিয়াছিল যে টানাটানিতে কিছুই পাওয়া যায় না, নিজের মনের ক্ষতটাই শুধু বাড়ে। সে বলিলে হয়ত ইন্দিরা এখনই শয্যা একত্র করিবে। হুকুম করিলে পাশেও আসিয়া শুইবে—কিন্তু তাহাতে লাভ কি?

না, সুকুমার জোর করিয়া আর কিছুই চাহিবে না।...

একবার মনে হইল ইন্দিরার পিছনে গিয়া দাঁড়ায়, মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে, একটা সামান্য অপরাধও আমার মাপ করতে পারলে না ইন্দু? ভেবে দেখো সে অপরাধ ত তোমার জন্যেই করেছি, তোমাকে পাবার জন্যেই করেছি,—তবুও মাপ করতে পারলে না?

কিন্তু কথাগুলা নিজের কাছেই কেমন যেন নাটকের মত ঠেকিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না, নীরবে শুইয়া পড়িল।

ইন্দিরা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া এমনিই কোন অনুযোগের আশা করিতেছিল, হয়ত বা তাহার জন্য নিজেকে প্রস্তুতও করিতেছিল, কিন্তু সুকুমারের কাছ হইতে প্রতিবাদ বা অনুযোগের একটি শব্দও না আসাতে সে একটু বিস্মিতই হইল।...আরও খানিকটা তেমনিভাবে

স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সেও আলোটা নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

সেটা শুক্লপক্ষ। সামনেই অবারিত মাঠ—সেই তৃণ-লতাহীন, কঠিন কঙ্করময় বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে, তাহারই প্রতিফলিত আলো খানিকটা ঘরের মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। সুকুমারদের বহুদূরবিস্তৃত বাগানে অসংখ্য গোলাপ বেল-জুই-চামেলি-হেনা ফুটিয়া আছে, তাহাদের মিশ্রিত উগ্র সৌরভে যেন নেশা লাগে। সে গন্ধ অবিরাম প্রবাহিত দক্ষিণা বাতাসের সহিত ভাসিয়া আসিয়া বার বার দুটি নরনারীকে উতলা করিয়া তুলিতে লাগিল। উপভোগের সমস্ত উপকরণই প্রস্তুত, অথচ সেই মধুর রজনীতে এই নবীনবয়স্ক স্বামী-স্ত্রী দুইজন দুইটি পৃথক শয্যায় নীরবে ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া রহিল। সে রাত্রে তাহাদের ঘুমানো সম্ভব নয়, কেহ ঘুমাইতে পারিলও না।

চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশীর সেই মধুযামিনী সুকুমার ও ইন্দিরার জীবনে ব্যর্থ হইয়া গেল।

১৩

আনন্দ পরের দিন সকালবেলাই আসিয়া হাজির হইল।

'বৌদি কোথায়?' বলিয়া একটা হাঁক দিয়া বাহিরের টেবিলটার উপর টুপিটা ফেলিয়া বারান্দার ইজিচেয়ারেই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

সারারাত্রি জাগিয়া সুকুমার ভোরের দিকটায় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহার কণ্ঠস্বর কানে যাইতে তাড়াতাড়ি মুখে-চোখে জল দিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার সেই আরক্ত চক্ষু এবং

শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দ ভুল বুঝিল। ঈর্ষাতুর কণ্ঠে কহিল, ইস্—করেছিস্ কি!···দেহটার দিকেও একটু নজর রাখিস্।

ম্লান হাসিয়া সুকুমার কহিল, তাই বটে। কিন্তু তুই শুনলে অবাক হয়ে যাবি যে, আমরা পৃথক্-শয্যাতেই কাল রাত কাটিয়েছি। ঘুমোতে পারিনি অন্য কারণে—শরীরটা ভাল ছিল না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আনন্দ প্রশ্ন করিল, পৃথক্ শয্যা কেন? কাল আমারই অবিমৃষ্যকারিতার ফল নাকি?

প্রসঙ্গটাই বেদনাদায়ক, সুকুমার তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়া কহিল, না, না—এমনি, স্বাস্থ্যের অনুরোধে।...তারপর চা খেয়ে এসেছিস, না খাবি এখানে—?

দেখ্ চা এক কাপ খেয়েই এসেছি। কিন্তু তাই ব'লে বৌদির হাতের চা একটু খাবো না, এ যদি মনে ক'রে থাকিস্ ত বিষম ভুল করবি।

সুকুমার মৃদু হাসিল। তাহার ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, তোর বৌদিকে বল্‌গে যা, আনন্দবাবু এসেছেন, দু'পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা করতে—

অল্পক্ষণ পরে খুচরা দুই-একটা কথা কহিতে কহিতেই ইন্দিরা চা লইয়া দেখা দিল। তাহার চক্ষু আরক্ত, চোখের কোলে কালি—দেখিয়া সুকুমার একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু ঠিক কারণটা অনুমান করিতে না পারিয়া বরং মনে মনে যেন একটু অকারণ ঈর্ষাই বোধ করিতে লাগিল।

আনন্দ বেচারা এত কথা কিছুই জানে না—সে ততক্ষণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কহিতেছে, বৌদি, এখানে এসে ঘরে বসে থাকলে ত চলবে না, বেড়াতে হবে—তবে স্বাস্থ্য। সকালে বিকালে বেড়াতে হবে, চলুন দেখি, বেরিয়ে পড়া যাক্—

সুকুমার কহিল, এখন কোথায় যাবি রে—? বেলা আটটা বাজে যে—

তাচ্ছিল্যের স্বরে আনন্দ জবাব দিল, এখানে আবার আটটা কি, এখানে কি আর আফিস আছে? তা ছাড়া আজ হাটবার, চল্, হাটেই যাওয়া যাক্—! বৌদি, আপনি তৈরী হয়ে নিন্—

ইন্দিরা নতমুখে জবাব দিল, আপনারা ঘুরে আসুন, আমি ততক্ষণে বরং রান্নার জোগাড় দেখি—

আনন্দ সজোরে জবাব দিল, এ্যাব্‌সার্ড—এরি মধ্যে রান্নার জোগাড় কি? তা ছাড়া হাট না এলে জোগাড় দেবেনই বা কিসের? চলুন চলুন, তৈরী হয়ে নিন্।

কিন্তু ইন্দিরা তবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল দেখিয়া আসল কথাটা এতক্ষণে আনন্দর মাথাতে গেল, কহিল, ও, আসলে আপনার হাটে যেতেই আপত্তি বুঝি! মাই গুডনেস্—একি আপনাদের দেশ, না কলকাতা শহর, যে মেয়েরা বাজারে গেলে নিন্দে করবে। এখানে মেয়েদের হাটে যাওয়াই চাল—না গেলেই লোকে অবাক হয়। তা ছাড়া এখানে মেয়েরাই ত বাজার করে। আর বেড়াবার জায়গাই বা এমন কোথায় আছে বলুন, যে রোজ দু'বেলা গেলে অরুচি হবে না? তার চেয়ে সকালটা হাট-বাজারের জন্যেই রাখুন—

কিন্তু তবু ইন্দিরা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া আনন্দ পুনশ্চ কহিল, আচ্ছা, ফর ওআন্স আমাকে বিশ্বাস করুন! সেখানে গিয়ে দেখবেন যে কত সম্ভ্রান্ত মহিলারা এসেছেন কর্তাদের সঙ্গে—এ যদি মিলিয়ে না পান ত আমাকে যা তা বলবেন বরং। দেখুন না কেমন মনোরম পথ ধরে নিয়ে যাই। ওই ওধারের ঐ উঁচু-নীচু মাঠটা পেরিয়ে একটা গোরস্থানের পেছন দিয়ে, পুষ্পিতা মহুয়া গাছের নীচে দিয়ে যেতে এক সময় দেখবেন যে হাটের কাছে গিয়ে পড়েছেন। পথটি ভারি চমৎকার—চলুন, চলুন!

পুরুষ ও রমণী

তাহার আগ্রহকে আর এড়োনো গেল না। ঈষৎ আরক্ত প্রসন্নমুখে ইন্দিরা কাপড় বদ্‌লাইতে গেল।

সুকুমারও আনন্দের সাহচর্য্য ও চাপল্যে গতকল্যকার মেঘটা কাটিয়া যাইতে পারে মনে করিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে আনন্দের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, নে, শেষ পর্য্যন্ত তোরই জয়-জয়কার; চল্—কোথায় হাটে বাজারে যাবি!

বাস্তবিকই পথটি ভারি চমৎকার। শেষ পর্য্যন্ত শহরের পথে পড়িতে হয় বটে, কিন্তু তবু অনেকখানি নির্জন রাস্তায় চলা যায়। নিম গাছ ও মহুয়া গাছের ছায়ায় পথটি শীতল ও ফুলের গন্ধে মদির। সেই পথে চলিতে চলিতে আনন্দ যেন আরও প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিল। সে যে আপন মনে কত কথাই অনর্গল বকিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। কতক বা ইন্দিরার কানে গেল, কতক বা গেল না, তবু সমস্তটা জড়াইয়া তাহার বেশ ভালোই লাগিতেছিল। আলো-ঝলমল প্রভাত, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, ছায়াশীতল এই পথটি এবং ভ্রমণের আনন্দ সবগুলি মিলিয়া তাহার মনে যেন এক নেশা ধরাইয়া দিয়াছিল, আর তাহারই রঙীন অস্পষ্টতায় এই প্রিয়দর্শন যুবকটির অবিশ্রাম গুঞ্জন ভালো লাগিতেছিল।

পথেই একটা বাঁধানো কুয়া পড়ে, কতকগুলি সাঁওতালী ও হিন্দুস্থানী মেয়ে সেখানে দাঁড়াইয়া জল তুলিতেছিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া ইন্দিরার মনে হইল, বা, ইহারা ত বেশ! রেল কোয়ার্টারের বাগানে ফিরিঙ্গীদের ছেলেমেয়েগুলি ছুটাছুটি করিতেছে, সেদিকে চাহিয়াও ইন্দিরা চোখ ফিরাইতে পারে না। এ যেন কোন্ এক স্বপ্নরাজ্য, এখানে সবই নূতন, সবই মধুর। এমনটি সে কখনও দেখে নাই—তাই তাহার কাছে সবই ভাল লাগিতেছিল।

আনন্দ কথা কহিতে কহিতে তাহার উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কি বৌদি, পথটি ভাল না?

ইন্দিরা বেশ একটু জোর দিয়াই কহিল, ভারী চমৎকার!

তাহার কণ্ঠস্বরে যে আবেগ ধ্বনিত হইল তাহা একেবারেই অপরিচিত।

সুকুমার বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল আনন্দে ও উত্তেজনায় ইন্দিরার মুখ আরক্ত, বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত—এ যেন নূতন ইন্দিরা। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, আনন্দ ত বেশ জমাইয়াছে, বাহাদুরী আছে ছোক্‌রার!…

অবশ্য হাটের কাছে আসিয়া ইন্দিরা একটু প্রকৃতিস্থ হইল। লোকের ভীড়ে অসংখ্য লুব্ধদৃষ্টির মধ্যে সঙ্কুচিত না হইয়া উপায়ও ছিল না। সুকুমার মনে করিয়াছিল বাজারের কাছে গিয়া ইন্দিরা ভীড় দেখিলে কিছুতেই ভিতরে যাইতে চাইবে না; কিন্তু ইন্দিরা মাথায় কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিলেও শেষ পর্য্যন্ত সে হাটের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িল। অতি শৈশবে বাপের সহিত সে হাটে যাইত, আজ তাহার স্মৃতি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, তবু মনে হইল যেন শৈশবেরই একটা আনন্দের আভাস এতদিন পরে আবার দেখা দিয়াছে—

আনন্দ কহিল, কী বৌদি, কিনুন কিছু।

ইন্দিরা স্মিতমুখে জবাব দিল, আসবারই কথা ছিল, কেনবার ত ছিল না—

আনন্দ কহিল, বা, তাই কি হয়। বলুন, কি কিনবেন।

ইন্দিরা লজ্জিতভাবে কহিল, আমি আর কি কিন্‌ব বলুন, আপনারা কিনুন আমি দেখি—

আনন্দ প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল,সে হয় না। আপনি হুকুম করুন অন্তত, আমরা কিনতে রাজী আছি।

কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে ইন্দিরা জবাব দিল, যা হুকুম করবো তাই কিনবেন?…দেখবেন, এর পর না বিপদে পড়েন!

কিছু না। আপনি বলুন না, আমি হাটসুদ্ধ কিনে ফেলছি—

পুরুষ ও রমণী

অগত্যা ইন্দিরাকেও দুই-একটা ফরমাস করিতে হইল। সুকুমার দাম দিতে যাইতেছিল আনন্দ কিছুতেই তাহাতে রাজী হইল না, উপরন্তু একরাশ আনাজ ও মাছ কিনিয়া ফেলিল।...

ফিরিবার পথে গাড়ী ভাড়া করা হইল। ফিরিতে ফিরিতে ইন্দিরা কহিল, কিনলেন ত যা মনে এল তাই, ওগুলো কিন্তু সব খেতে হবে। এবেলা, ওবেলা, কাল—যতদিন না শেষ হয়, এখানেই খাবেন!

আনন্দ কি একটা জবাব দিল তাহা সুকুমারের কানে গেল না! সে অবাক হইয়া ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল যে এ কেমন করিয়া সম্ভব হয়, একদিনের এই সামান্য পরিচয়ে আনন্দ কেমন অনায়াসে ইন্দিরাকে চটুল ও মুখর করিয়া তুলিয়াছে, অথচ সুকুমার শত চেষ্টা করিয়াও সেই পাষাণ প্রতিমাকে এতটুকু উত্তপ্ত করিতে পারে না কেন?...

সুকুমার একটু অন্যমনস্কই হইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ী যখন বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল তখন সে সহসা সচেতন হইয়া ভাবিয়া দেখিল মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ঈর্ষার সুরই বাজিতেছে। ছি, ছি, সে কি ছেলেমানুষ হইয়া গেল—ছিঃ।

সে জোর করিয়া আনন্দর কাঁধে একটা চাপড় মারিয়া কি একটা রসিকতা করিয়া উঠিল।

ঠাকুর সঙ্গে আসা সত্ত্বেও ইন্দিরা নিজেই রান্নাঘরে গিয়া রন্ধন-কার্য্যে লাগিয়া গেল। শ্বশুরবাড়িতে স্নেহ যথেষ্ট পাইলেও সম্ভ্রমের খাতিরে সেখানে স্বাধীনতা থাকে খর্ব হইয়া। সহসা এখানে আসিয়া ইন্দিরা সব দিক দিয়াই স্বাধীনতা পাইল। এখানে সে-ই গৃহিণী, তাহার উপর কথা কহিবার কেহ নাই। তা ছাড়া এটা বিদেশ, এখানে এমনিই মনটা চটুল হইয়া উঠে, গতিবিধি হইয়া পড়ে স্বেচ্ছাচারী।

আনন্দও আহারের নিমন্ত্রণ পাইয়া একেবারে জাঁকিয়া বসিল। নিজের

বাসা হইতে চাকরকে দিয়া ঢিলা পায়জামা আনাইয়া লইয়া সেখানেই বেশ পরিবর্তন করিল তাহার পর একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া একেবারে রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে ভর করিল। সে একাই বকিয়া যায় অনর্গল, ইন্দিরা স্মিত প্রসন্নমুখে তাহার বকুনি শোনে আর হয়ত মধ্যে মধ্যে একটা মন্তব্য করে। এই পাগল তরুণটিকে তাহার ভালোই লাগিতেছিল। ইহার কাছে গম্ভীর হইয়া যেন থাকাই যায় না, যেখানেই থাকে চারিপাশে চটুল আবহাওয়া একটা তৈরী করিয়া লয়।

সুকুমার এত বকিতে পারেও না, তাহার তখন সে রকম মানসিক অবস্থাও নয়! সে তাহার বকুনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিল তাহার বিবাহের পূর্বের দিনটির কথা। কেমন অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি ছিল তাহার, এতটা মুখর না হইলেও—সে ফুর্তিবাজই ছিল। বন্ধুদের লইয়া আনন্দ করিয়া দিন কাটিত, একটানা একটা উৎসবের মত। মিছিমিছি এ কী করিল সে, একুলও পাইল না, ওকুলও গেল।

সহসা এক সময়ে তাহাকে ঠেলা দিয়া আনন্দ ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—লাকী ডগ! এ যে একেবারে অমূল্য রত্ন! জুয়েল! সতীশ বেচারীর জন্য দুঃখ হচ্ছে!

সতীশের নামটা কানে যাইতেই সুকুমার যেন শিহরিয়া উঠিল। আড়চোখে ইন্দিরার দিকে চাহিয়া দেখিল পরিশ্রমে ও তাপে তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ললাটে সুন্দর স্বেদবিন্দু, আনন্দ ও উত্তেজনায় সমস্ত দেহ যেন উদ্ভাসিত—সেদিকে চাহিলে সমস্ত বাসনা নিমেষে অত্যুগ্র হইয়া ওঠে!...

চাহিয়া চাহিয়া সুকুমারের বুকটা জ্বালা করিয়া উঠিল, সে কোন প্রায় টলিতে টলিতে উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল।

১৩

আনন্দর সেই যে প্রতিষ্ঠা হইল এ বাড়িতে, তাহা আর নষ্ট হইল না। সে না থাকিলে এই নব-বিবাহিত তরুণ দম্পতীর দিন কি করিয়া কাটিত বলা কঠিন, নির্জন স্থানে তাহাদের এই ব্যবধান হয়ত অসহ হইয়াই উঠিত। কিন্তু আনন্দর প্রগল্‌ভ মুখরতা তাহাদের সমস্ত গ্লানিকে ঢাকিয়া জীবনযাত্রাকে চলনসই করিয়া তুলিল। সে-ই জোর করিয়া তাহাদের ঠেলিয়া বাহির করে বিকাল বেলা, সকালে লইয়া যায় হাটে, নয়ত এমনি বেড়াইতে লইয়া যায়।

আনন্দ যে এম্‌নি করিয়া কী-ভাবে তাহাদের জীবনের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গেল তাহা না সুকুমার, না ইন্দিরা, কেহই বুঝিতে পারিল না।

অথচ, আনন্দকে ইন্দিরা ঠিক বুঝিতে পারে না! তাহাকে যতই দেখে, ততই যেন একটা সমস্যায় পড়ে। সে নিভৃত পল্লীগ্রামের মেয়ে, সেখানে সমস্ত পুরুষ জাতটাকে অপর কয়েকটি স্ত্রীলোকের চোখের মধ্যে দিয়া তাহাকে দেখিতে হইয়াছে। শিক্ষাও নামমাত্র, গোনা কয়েকখানি বই পড়িতে পাইয়াছে সে, শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াই তাহার যাহা কিছু পরিচয় সংসারের সঙ্গে, বলিতে গেলে সে-ই তাহার প্রথম পৃথিবীর পথে পা দেওয়া। সুতরাং তাহার সহজ বুদ্ধি যতই থাক্, আনন্দর চমক-লাগানো বিদ্যাবুদ্ধিতে তাহার চোখ ধাঁধিতে বাধ্য। তবু যেন ঠিক ভালও লাগে না। কোথায় একটা খট্‌কা বাধে। একই সঙ্গে সে আনন্দর প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ এবং গোপন বিতৃষ্ণা অনুভব করে।

আনন্দ আসিয়া প্রত্যহ যখন কথা বলিতে থাকে, তাহার সরস কথা-বার্তা, কথা বলার উদ্দীপ্ত ভঙ্গী এবং বিলাতী বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার ঝাঁজে ইন্দিরা আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। সে নিজে ঠিক পুরাপুরি সে-

গল্পে যোগ না দিতে পারিলেও শুনিতে শুনিতে মুখ চোখ তাহার উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। তাহার প্রথম বয়সে হরেনবাবুর স্ত্রীর নিকট হইতে চাহিয়া পড়া ডিটেক্‌টিভ গল্পের কথা মনে পড়ে, এমনই উত্তেজনা হয় তখন।

সে উদ্দীপনা সুকুমারও দেখে এবং ভুল বোঝে। কিন্তু মনে মনে ব্যথা পাইলেও সে ইন্দিরাকে দোষ দেয় না, বরং আনন্দর বক্তৃতায় ইন্ধন যোগায়। তাহাকে বিকশিত হইবারই সুযোগ দেয় সে। মনে মনে মন্ত্রের মত জপ করে 'ইহাই উচিত, ইহাই আমার প্রাপ্য।'

কিন্তু আনন্দ চলিয়া যাওয়ার পরই ইন্দিরা কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকে। মনে হয় এতক্ষণ ইহার সাহচর্য্যে কাটানোর মধ্যে কোথায় একটা অন্যায়, অশোভনতা আছে। এই সমস্ত উজ্জ্বল কথাবার্তার মধ্যে কেমন করিয়া বক্তার অন্তরের একটা নীচতা প্রকাশ পায় তাহা ইন্দিরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, শুধু মনে মনে পীড়িত হয়; মনে হয় এ লোকটি ভাল নয়—ইহার এই সমস্ত দীপ্তি এবং ভদ্রতার অন্তরালে কোথায় একটা অত্যন্ত গ্লানিকর বৃত্তি আছে, তাহা সুযোগ পাইয়া যখন এক সময়ে আত্ম-প্রকাশ করিবে তখন এতটা প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য অনুশোচনার আর অন্ত থাকিবে না।

শুধু তাই নয়—আনন্দর পাশে শান্ত, ভদ্র সহনশীল সুকুমারকে যেন মানুষ হিসাবে অনেক বড় বলিয়া মনে হয়। কেন তাহা বোঝা যায় না। তবু মনে হয় এ লোকটার চেয়ে তাহার স্বামী অনেক বেশী শ্রদ্ধার যোগ্য। অথচ এই সুকুমারকে ত সে মানুষ হিসাবে ছোট জানিয়াই শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছে এবং এখনও সেই বিশ্বাসেই সে তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখে। নিজের অন্তরের স্বত-উৎসারিত প্রেম ও শ্রদ্ধাকে জোর করিয়া সংহত করে সে।

হয়ত ঠিক এমন ভাবে গুছাইয়া ইন্দিরা ভাবিতে পারে না,

এমনভাবে হিসাব করিয়া মানুষের পরিচয় লইতে শেখে নাই, তবু সমস্ত ব্যাপারটা কেমন একটা খচ্ খচ্ করিতে থাকে কানের মধ্যে—মনে মনে অস্বস্তির অবধি থাকে না। যদিও, কি করা উচিৎ তাহাও ভাবিয়া পায় না।

কিন্তু আনন্দ এ সমস্ত ধার দিয়াই যায় না। বিলাতে সে মেয়েদের বশ করিয়াছে অন্য উপায়ে। সেখানকার সমাজ সংস্কার ভিন্ন রকমের, সে মেয়েরাও ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এখানে যে সে-মন্ত্র কার্য্যকরী হইবে না, তাহা আনন্দর সুচতুর ও অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে অনেকদিনই ধরা পড়িয়াছিল।

অবশ্য ঠিক বশ করা বলিতে যাহা বোঝায় সে রকম কোন ইচ্ছাও হয়ত ছিল না, বন্ধুত্বের মর্য্যাদা সে জানিত এবং রাখিবার চেষ্টাও করিত। এই মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল, তাই সে চাহিত তাহার সাহচর্য্য। এবং কেমন করিয়া সে বুঝিয়াছিল যে এই মেয়ের শ্রদ্ধা অর্জন করার মধ্যেই যথেষ্ট বাহাদুরী আছে। হয়ত এতদিন যে খেলা সে মেয়েদের সঙ্গে খেলিয়াছে তাহাতে তাহার আর প্রবৃত্তিও ছিল না—তাই ইন্দিরার শুধু শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জনের জন্যই প্রাণপণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

স্নেহ আদায় করিতেও সে জানে। প্রতিদিন নূতন নূতন আহারের আব্দার ছিল তাহার ইন্দিরার কাছে। নিজের সাহেবীয়ানার দুর্দ্দশার বিবরণ দিয়া সে সহানুভূতি আকর্ষণ করিত, এবং কত পয়সা খরচ করিয়াও যে কী অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাহার দিন কাটে, চাকর-খানসামারা যে কী পর্য্যন্ত হৃদয়হীন ইহারই নিত্য নূতন কাহিনীতে ইন্দিরার মনে উদ্রেক করিত করুণা। সেই সব মুহূর্তগুলিতে আনন্দ সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় চলিয়া যাইত, সে প্রসন্ন-হাসিমুখে আনন্দর সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিত।

সহসা একদিন হয়ত বলিয়া বসিত, পাটিসাপ্‌টা করতে জানো না বৌদি ?

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িয়া জানাইত, হাঁ।

এটা সে শ্বাশুড়ীর কাছে সম্প্রতি শিখিয়াছে।

উৎসাহে আনন্দ লাফাইয়া উঠিত, কি কি চাই বলুন ত বৌদি, এখনই আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।

তখন বলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকিত না।

ইন্দিরা যদি বলিত, 'আমিই আনাচ্ছি চাকরকে দিয়ে'—সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইত। বলিত, আমাকে বললে কি কোন দোষ হ'ত? আপনি আমাকে এমনিই পর ভাবেন বটে। জানেন, আমি সুকুমারের একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু ?

অগত্যা ইন্দিরাকে বলিতে হইত। বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের চার গুণ বেশী মাল আনিয়া হাজির করিত। ক্ষীরই আনিত হয়ত চার সের।

সুকুমার আর ইন্দিরা দুজনেই অনুযোগ করিত কিন্তু সে সব কথা আনন্দ উড়াইয়া দিত। বলিত, ও এক-আধটু বেশী আনলে ক্ষতি কি ? না হয় কিছু ফেলা যাবে। কম পড়লে কী বিপদ হ'ত বলুন দেখি !

এমন মানুষকে কি পারা যায়।

আর একদিন কী কথায় ইন্দিরা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, এদেশে পদ্ম হয় না বুঝি ?

আনন্দ জবাব দিয়াছিল, না। এখানে জল কৈ, দেখছেন না চারদিকে মাটি ফেটে আছে। আপনাদের দেশে হয় বুঝি খুব ?

তাহার পিত্রালয়ের কথা উঠিতেই ইন্দিরা কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করিত। সেদিনও একটু কুণ্ঠিত-ভাবে মাথা নামাইয়া জবাব দিয়াছিল, খুব না, তবে হয়।

পুরুষ ও রমণী

নিতান্ত সাধারণ প্রশ্ন এবং সাধারণ উত্তর। সে কথা আর কাহারও মনে নাই। তিন চার দিন পরে কিন্তু সহসা কলিকাতা হইতে এক নার্শারীর লোক আসিয়া হাজির। একঝুড়ি পদ্ম তাহার সঙ্গে। বলে, এই ঠিকানাতেই পৌঁছে দেবার কথা আছে—

সুকুমার এবং ইন্দিরা দুজনেই স্তম্ভিত। সে কি? কে অর্ডার দিয়েছে?

তাহা সে লোকটি জানে না। অর্ডার গিয়াছে—একঝুড়ি পদ্মফুল এখানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য।

ব্যাপারটা দুজনেরই বুঝিতে বাকী রহিল না। ইন্দিরা লজ্জায় মরিয়া গেল; মনে মনে বার বার প্রতিজ্ঞা করিল যে আর জীবনে সে আনন্দর সহিত কথা কহিবে না, কিছুতেই না। এমন লোক সে!...কিন্তু সুকুমার একবার মাত্র শান্ত দৃষ্টি মেলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল—তারপর হাসিয়া উড়াইয়া দিল, ও ছোঁড়া এমনিই পাগল—বরাবর।

তবু ইন্দিরা রাগ করিয়া রহিল এবং দেখা হইলে বেশ গম্ভীরভাবেই তাহাকে শাসন করিবে স্থির করিয়া রাখিল। কিন্তু আনন্দ সেদিন সে-দিক দিয়াই গেল না। বরং সন্ধ্যাবেলা চাকরকে পাঠাইয়া দিল; সে আসিয়া জানাইল, বাবুর জ্বর হয়েছে, একটু ভাল ক'রে সাবু তৈরি ক'রে দিতে বলেছেন।

অগত্যা সাগু প্রস্তুত করিয়া দিতে হইল এবং পরের দিন রুক্ষ চুল ও শুষ্ক মুখ লইয়া অপরাধী আসিয়া যখন হাজির হইল তখন কুশল-প্রশ্নই করিতে হইল। শাসন করা আর ঘটিয়া উঠিল না।

ইন্দিরা আর সুকুমারের মধ্যেকার সম্পর্কটা আছে সেই রকমই। প্রয়োজন মত ইন্দিরা সহজভাবেই কথা বলে, কিন্তু শুধু প্রয়োজনমতই। রাত্রে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপের মধ্যে, পাগলকরা দক্ষিণা বাতাসের

সমারোহের মধ্যে দু'জনে শুইয়া থাকে দুইটি পৃথক শয্যায়, নিঃশব্দে নীরবে।

সুকুমার কিছুই বলে না, বৃথা টানা-হেঁচড়াতে আর তাহার প্রবৃত্তি নাই, একতরফা প্রেম নিবেদন করিতে যেন তাহার ঘৃণা বোধ হয়! সে সঙ্গে থাকে, বেড়াইতেও যায়, কথাবার্তাতেও যোগ দেয় তবু যেন কিছুতেই তাহার উৎসাহ নাই। শীতল স্নিগ্ধ সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়াও অসহ্য তৃষ্ণায় সে দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে।

একদিন অপরাহ্ণে সে বসিয়া এই কথাই ভাবিতেছে এমন সময় অত্যন্ত লঘুপদে ইন্দিরা ঘরে প্রবেশ করিল। কহিল, আনন্দ ঠাকুরপো বলছেন আজ পাথ্‌রোল যাবার কথা, তিনি গাড়িও ঠিক করেছেন,—

অকস্মাৎ যেন সুকুমারের সমস্ত মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু সে প্রাণপণে চিত্তদমন করিয়া কহিল, বেশ ত, যাও না—

সহজ কথা, কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোথায় একটা গোলমাল ঠেকিল। ইন্দিরা একটু ইতস্তত করিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার কাপড়-জামা এইখানে এনে দেব?

সুকুমার তাহার মুখের উপর ক্লান্ত দৃষ্টি মেলিয়া কহিল, কেন আমাকে এমন টানাটানি করো ইন্দিরা, আমাকে দুঃখ দিয়ে কি তোমার সাধ মিটছে না? এখানে এইভাবে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, এ যে কি প্রাণান্ত দুঃখ তা কি বোঝ না? এতে তোমার লাভ কি? তার চেয়ে তুমিই যাও, তুমি সুখে থাকো, আনন্দ পাও, যা খুশী তাই করো—আমায় শুধু রেহাই দাও!

অব্যক্ত যন্ত্রণার এমনই একটা আকুতি ফুটিয়া উঠিল সুকুমারের কণ্ঠে যে নিজের অজ্ঞাতসারেই ইন্দিরার মুখে বেদনার ছায়া দেখা দিল।

সে চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু সুকুমার চুপ করিল না, তেমনি একটা চাপা অথচ তীব্রকণ্ঠে বলিয়া চলিল, এই বিদেশে আমি সর্বদাই

তোমার সঙ্গে রয়েছি, তবু আমি তোমার কাছে বোধ হয় ঐ মালির চেয়েও পর। অথচ বাইরে সব সময়ে সেই কথাটাই ঢেকে রাখবার চেষ্টা করতে হয়। ঢাকাও থাকে না, শুধু এই টানাটানি, এই উঞ্ছবৃত্তি এ আর আমি সইতে পারছি না। আমি অপরাধ যতই করে থাকি, তোমার কাছে ত করিনি, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও—

আরও কি বলিতে যাইতেছিল সে, কিন্তু সহসা ইন্দিরার বিবর্ণ নতমুখের দিকে নজর পড়িতেই থামিয়া গেল। ইন্দিরা স্তব্ধ হইয়া ঘরের ঠিক মাঝখানে তেমনিভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

সুকুমার রহিল নিঃশব্দে দূর আকাশের দিকে চাহিয়া।

এইভাবে মিনিট কয়েক কাটিয়া গেল, আরও কতক্ষণ কাটিত কে জানে, হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মত প্রবেশ করিল আনন্দ।

কহিল, কি বৌদি, এখনও তৈরী হয়ে নেন্‌নি? ফিরতে দেরি হবে যে!

প্রাণপণে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করিয়া লইয়া ইন্দিরা জবাব দিল, ওঁর বড্ড মাথা ধরেছে ঠাকুরপো, আজ আর যাওয়া হয় না—

আনন্দের কণ্ঠে পরিষ্কার হতাশা ফুটিল, মাথা ধরেছে নাকি রে? কখন ধরল? একটু বাইরের হাওয়ায় গেলে বোধহয় ভালই হ'তো—

চলিয়া যাইতে যাইতে দ্বারপথ হইতে ইন্দিরাই জবাব দিয়া গেল না, সে হয় না। শরীর খারাপ থাকলে কিছু ভাল লাগে না বরং সামনের মাঠে একটু পায়চারী করেন ত করুন!

ইন্দিরা চলিয়া গেল, আনন্দও 'তাই ত গাড়িও'লাটা আবার'— বলিয়া শীষ্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু ইন্দিরার এই সামান্য কথাতেই সুকুমারের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। ইন্দিরা তাহার মানসিক অবস্থাকে সম্মান করিয়াছে, তাহার জন্য মিথ্যা বলিয়া তাহার দৈন্যকে ঢাকিয়া লইয়াছে, তাহার জন্য উৎকণ্ঠাও দেখাইয়াছে—এই সব

তুচ্ছ ছোট ছোট কথাতেই তাহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল, ইন্দিরার ইচ্ছাকে এমনভাবে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য অনুতাপেরও সীমা রহিল না।···

একটুখানি ইতস্তত করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ভিতরের বারান্দায় বসিয়া ইন্দিরা তখন অপরাহ্ণের জলখাবারের জন্য ফল কাটিতেছিল, দাসী-চাকর কাছে কেহ নাই দেখিয়া সুকুমার তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমার মাথার ঠিক ছিল না, কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি, তুমি কিছু মনে ক'রো না। চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি···

বোধহয় অতি ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ইন্দিরার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। সে মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, আজ থাক্—

সুকুমার মিনতি করিয়া বলিল, চলো না লক্ষ্মীটি, অন্তত নদীর ধারেই একটু যাওয়া যাক্।

মাথা নাড়িয়া ইন্দিরা কহিল, সে হয় না। ঠাকুরপো কি ভাববেন তা হ'লে! জল খেয়ে তুমিই একটু ঘুরে এসো।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। সুকুমার হয়ত আশা করিয়াছিল ইন্দিরাই রাত্রে আর কিছু বলিবে, হয়ত বা অনুতাপের সুর তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে কিন্তু সে সব কিছুই হইল না, ইন্দিরা প্রতিদিনের মতই নিঃশব্দে আসিয়া তাহার পৃথক শয্যাতে শুইয়া পড়িল।···

পরের দিন সুকুমারই উপযাচক হইয়া পাথরোল যাত্রার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু এইভাবে বেড়াইতে যাওয়া সত্যই তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। আনন্দ তাহার সঙ্গ ঠিক চায়ও না, ইন্দিরার দিকেই তাহার মনোযোগ, বেড়াইতে বাহির হইয়া সে তাহাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। অনর্গল বকিয়া, হাস্য-পরিহাসে ইতিহাসে-কল্পনায় সে ইন্দিরাকে মাতাইয়া তুলিতে চায়।

পাথরোল যাত্রাও সুতরাং সুকুমারের কাছে ব্যর্থ হইয়া গেল। সে

গাড়ীতে সমস্তক্ষণই চুপ করিয়া রহিল, কারণ কথা বলার ভূমিকা আনন্দ এবং সায় দেওয়ার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল ইন্দিরা—তাহার মধ্যে সুকুমার যেন অতিরিক্ত। কালীবাড়িতে পূজা দিবার সময় দু-একটা কি পরিহাস করিবার চেষ্টা করিয়া সে আবার নিঃশব্দেই উহাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরিল। যে সুন্দরী কিশোরীর উপস্থিতি আনন্দকে অত মুখর করিয়া তুলিয়াছিল সেই মেয়েটির পাশে বসিয়া তাহার উষ্ণ কোমল দেহের সংস্পর্শ প্রতিনিয়ত পাইয়াও তাহার স্বামীর কণ্ঠে কোন প্রকার কথা ফুটিল না। সে যেন ইহাদের অপরিচিত, পর।

সেই দিনই বাড়ি ফিরিয়া সুকুমার প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর নয়, এ অভিনয়ের এইখানেই শেষ করিতে হইবে, আর সে এমন করিয়া নিঃশব্দে পুড়িতে পারিবে না—

সেদিন সারারাত্রি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না, শুধু এই কুৎসিত অবস্থা হইতে প্রাণপণে মুক্তির উপায় খুঁজিতে লাগিল। উপায় একটা পাইলও—

পরের দিন অপরাহ্ণে আনন্দ আসিবার আগেই সে ইন্দিরাকে ডাকিয়া কহিল, ওগো শুনছ, আমার আজ একটা জরুরী লেখা আছে, একটা মাসিকপত্রে আগে আমি মাঝে মাঝে লিখ্‌তুম, তারা অনেক ক'রে একটা লেখা চেয়ে পাঠিয়েছে—আজকে শেষ না করলেই নয়। তোমরা দু'জনেই আজ বেড়িয়ে এসো, আমি আজ আর যেতে পারবো না।

ইন্দিরা বিস্মিত হইয়া সুকুমারের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু সে মুখে রাগ বা অভিমানের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাইল না। তবু সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, বেশ ত, আজ না হয় বেড়ানো নাই হ'ল—

ব্যস্ত হইয়া সুকমার কহিল, না, না, সে হয় না। তাহ'লে আবার আমার মনটায় খচ খচ্‌ করতে থাকবে। মনে হবে, আমার জন্যে তোমাদের বেড়ানো হচ্ছে না—ফলে বেড়ানোও হবে না, লেখাও হবে

না। তোমরাই যাও, লক্ষ্মীটি, আমি যখন বলছি, তখন কোন দোষ হবে না। না হয় অল্প একটু ঘুরে এস—

ইন্দিরার যেটুকু সন্দেহ ছিল, এই শেষের পাঁচ-ছয়টি শব্দে তাহা দূর হইয়া গেল। তাহা ছাড়া এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত এই বেড়াইতে যাওয়া যেন নেশার মতই পাইয়া বসিয়াছিল তাহাকে, না গেলে তাহার কষ্টই হইত। তাই আনন্দ আসিতে সুকুমার যখন আবার এই অনুরোধই করিল, তখন সে দু-একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রাজিই হইয়া গেল।

কিন্তু রাজি হইলেও, ঠিক বাহির হইবার সময় আর একা বাহির হইতে পারিল না, ঝিকে ডাকিয়া সঙ্গে লইল। ফলে সেদিন আর ভ্রমণটা জমিল না। বয়স্থা দাসীর সঙ্গটা আনন্দকে ভিতরে ভিতরে পীড়া দিতে লাগিল, সে আর বেশী কথা কহিল না। অধিকাংশ সময় চুপ করিয়াই রহিল সে। আর ইন্দিরারও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল, সে নদীর ধার পর্য্যন্ত গিয়াই 'চলুন ফেরা যাক্'—বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

সুকুমার সত্যই কি একটি লিখিতেছিল। ইন্দিরাদের অত সকালে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তবু সে সহজ কণ্ঠেই বিস্ময় প্রকাশ কহিল, তোরা এরি মধ্যে এলি যে, কতটুকু বেড়ালি।

আনন্দ ভাল করিয়া সে কথার উত্তর দিল না। গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুকুমার ব্যাপারটাকে আস্তে আস্তে সওয়াইয়া লইতেছিল। পরের দিন সে উহাদের সঙ্গে বাহির হইল বটে, কিন্তু তাহার পরের দিন আবার একটা ছুতা করিল। অথচ ইন্দিরাকে যাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। ইন্দিরা, এ ব্যবস্থায় অসুবিধা বোধ করা

সত্ত্বেও, একেবারে 'না' বলিতে পারিল না। ঝিকে সঙ্গে যাইবার জন্য ডাকিতে, সে স্পষ্টই মুখের উপর বলিয়া দিল, না বৌদি, সে আমি পারব না। এ পাহাড়ে দেশে হাঁটা আমার কর্ম নয়—সেদিন হেঁটেই আমার গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে।

অগত্যা ইন্দিরা একাই বেড়াইতে গেল আনন্দর সঙ্গে। কিন্তু সেদিন কে জানে কেন সে বাহিরের নির্জন প্রান্তরের দিকে না গিয়া অপেক্ষাকৃত জনবহুল পল্লীতে বেড়াইতে গেল এবং সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিল। স্বামীর প্রতি বিরূপ হইয়া থাকিলেও তাঁহার সঙ্গ যে বাঞ্ছনীয় সেটা ইন্দিরা আজ প্রথম অনুভব করিল। সুকুমার যদিও নীরবে থাকে, তবু তাহার সঙ্গে থাকিলে ইন্দিরা যেন অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সে না থাকিলে যেন কিছুতেই জমে না।

ইহার পরে দিন-দুই সুকুমার যথারীতি উহাদের সাহচর্য্যে কাটাইল, কিন্তু তাহার পরই আবার এক ছুতায় ডুব মারিল। আনন্দ কোথা হইতে একখানা মোটর গাড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল, কথা ছিল তাহারা ঐ গাড়িতে করিয়া সেদিন গিরিডির দিকে বেড়াইতে যাইবে। অমন প্ল্যানটা মাটি হইয়া যায় দেখিয়া আনন্দর মুখ শুকাইয়া উঠিল, কিন্তু সুকুমার কিছুতেই যাত্রাটা নাকচ করিতে দিল না, একরকম জোর করিয়াই ইন্দিরাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। কহিল, লাহিড়ী মশাই বুড়ো মানুষ, ধরেছেন আজ আমাকে তাঁর নাটক শোনাবেনই। না গেলে বড্ড ক্ষুণ্ণ হবেন। তোরা যা, যদি কোনমতে বুড়োকে ঠাণ্ডা করতে পারি ত এই সাড়ে পাঁচটার ট্রেণে চেপে বসব। আসবার সময়ে একবার স্টেশনটা হয়ে আসিস্ বরং—যদি যাই ত ঐখানেই থাকব।

ইহার পর আর অন্য সন্দেহ থাকে না। ইন্দিরা নিশ্চিন্ত হইয়াই মোটরে উঠিল, যদিও এতটা পথ আনন্দর সহিত একা যাওয়াতে

কেমন যেন তাহার সংস্কারে বাধিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত মনকে সে প্রবোধ দিল—ড্রাইভার ত আছে !···

অবারিত মাঠ দূরে পাহাড়ের নীল রেখা। মোটর চলিয়াছে হু-হু করিয়া যেন শূন্য দিগন্তেরই দিকে। অপূর্ব্ব দৃশ্য। এমন সোনার দেশ যে হয় তাহা ইন্দিরা কখনও কল্পনা করে নাই। সে প্রাণপণে তুই চক্ষু ভরিয়া এই দৃশ্যটিকে যেন পান করিতেছিল, ইহার শালবন, উঁচুনীচু মাঠ, ঢেউ খেলানো রাস্তা, শুষ্ক বাতাস, দূরে পাহাড়ের ছবি সবই তাহার ভালো লাগে। হয়ত নূতন বলিয়া—তবু লাগে।

আনন্দও যেন আজ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এমনিতেই তাহার কথাবার্ত্তা অত্যন্ত সরস, এ ধরণের কথাবার্তা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কাছে বিস্ময়—তাহার উপর সেদিন সে যেন তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতাকেও লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। সে বিলাতফেরৎ, য়ুরোপটা ভাল করিয়াই দেখিয়াছে, তাহারই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সে গল্প করিতেছিল।

বিলাত, ফ্রান্স, সুইৎসার্লাণ্ড—কত দেশ, কত মানুষ, কত ঘটনার মজাদার গল্প। ইন্দিরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া যাইতেছিল; চক্ষু ও কর্ণ তুইই তাহার ব্যস্ত, তাই সে বুঝিতে পারে নাই যে গাড়িটার গতি কখন মন্থর হইয়া আসিয়াছে; যাওয়া-আসার এই পথকে দীর্ঘতর করিবার যে কোন ইঙ্গিত থাকিতে পারে তাহার মধ্যে, তাহাও সে কল্পনা করে নাই।

সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল স্টেশনে পৌঁছিয়া। আনন্দ নীচে নামিয়া খানিকটা ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, না, সে ছোঁড়া আসেনি। জানি সে আসবে না, আমাদের এড়িয়ে যাবারই মতলব ছিল তার।

হঠাৎ যেন একটা রূঢ় আঘাত লাগিল ইন্দিরার। সুকুমার ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়াছে—? কিন্তু কেন ?···তাহার মুখ দিয়া প্রশ্নটা বাহির হইয়াও গেল।

আনন্দ প্রথমটা কথা কহিল না। কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের হাসি চাপিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্দিরা আবারও, যেন ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই কহিল, কিন্তু তিনি ত কখনও মিথ্যে কথা বলেন না! তা ছাড়া, কেন আমাদের এড়িয়ে যাবেন তিনি!

আনন্দ সে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিল, না, তা নয় ওটা কথার কথা! তবে লাহিড়ী মশায়ের বাড়ী গিয়ে পড়লে কি আর বেরিয়ে আস্‌তে পারে—তাঁর নাত্‌নী কমলাটি আবার যা আছে! তার হাত ছাড়িয়ে বেরোনো বড় শক্ত কথা। এত বকতেও পারে—আর জোর ক'রে ধরে রেখে গল্প করবে! আমিও জানি ত।

কথাটা সামান্য, অবহেলার সুরেই বলা, তবু তাহার ইঙ্গিতটা বুঝিবার মত বুদ্ধি ইন্দিরার ছিল। এই কমলা মেয়েটিকে সে জানে, একটু বেশী রকমের গায়ে-পড়াই বটে এবং সে জন্য তাহাকে বরাবরই ইন্দিরা অপছন্দ করে। কথাটার অর্থ বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দিরার কান্ দুইটা যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। সেটা লজ্জায় কি অপমানে বলা শক্ত, তবে অকস্মাৎ সে যেন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তবু প্রাণপণে চিত্ত দমন করিয়া গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া অনুযোগের সুরে কহিল, ইস্ এ যে একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেল ঠাকুরপো, বাড়ি ফিরবো কখন?

আনন্দ কি যেন একটা গোলমাল করিয়া জবাব দিল, তাহার পর কহিল, একটু চা খাবেন বৌদি?

ব্যাকুলভাবে ইন্দিরা কহিল, না না, কিচ্ছু দরকার নেই। আমি ত চা খাই না, জানেনই। এখন একটু তাড়াতাড়ি গাড়িটা ছাড়ুন—

হ্যাঁ, এই যে—

তাড়াতাড়িতে একথাটা ইন্দিরার মনে হইল না যে, সে না খাইলেও

আনন্দর চা খাবার প্রয়োজন থাকিতে পারে। আনন্দরও সে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে, কে জানে কেন, সঙ্কোচ বাধিল।

আবার গাড়ি ছাড়িল। অন্ধকার পথ, বাহিরে দেখিবার কিছু নাই, ইন্দিরা গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল সুকুমারেরই কথা। তাহার এ আচরণের অর্থ কি, সে কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না! কিন্তু সে যে ইচ্ছাপূর্বকই তাহাদের বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে দূরে সরিয়া থাকে সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু কেন? এ কি শুধু অভিমান? না, আনন্দর এই কদর্য্য ইঙ্গিতের মধ্যে সত্য কিছু আছে! ···কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কিন্তু তাহার সারা অন্তর আলোড়িত করিয়া এই উত্তরটাই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—না, না, না। তাহার স্বামী এত নীচ কিছুতে না।

ইন্দিরার মনে তাহার বিবাহিত জীবনের প্রতিটি দিনের ইতিহাস যেন ভিড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। লেখাপড়া সে না-ই শিখুক, সুকুমারের ভালবাসার তীব্রতা বুঝিবার মত জ্ঞান তাহার হইয়াছে,—সেখানে যে অন্য কাহারও স্থান নাই তাহা সে জানে। তবু,—সেই মানুষ এমন করিয়া আর একজনের সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকে কি করিয়া! হউক না কেন সে বন্ধু, তবু পর ত!···

আনন্দরও ফিরতি-বেলায় কথোপকথনের উৎস যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সে চুপ করিয়াই বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। খানিকটা পরে, যেন একরকম মরিয়া হইয়াই, অতি সন্তর্পণে ইন্দিরার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে মুঠা করিয়া ধরিল।

বিলাতে সে অনেক মেয়ের সহিতই ফ্লার্ট করিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার খ্যাতিই ছিল, কিন্তু এই সরলা, পল্লীগ্রামের মেয়েটি সম্বন্ধে তাহার যেন সঙ্কোচের অবধি ছিল না। আজও সে কিছু ভাবিয়া-চিন্তিয়া আসে নাই,

এখনও সে কতকটা অভিভূতের মতই ইন্দিরার হাতখানা টানিয়া লইল—কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই।

ইন্দিরার ব্যাপারটা ভাল লাগিল না। তা ছাড়া তাহার মন আনন্দর প্রতি বিরক্তিতে ভরিয়াই ছিল। তবু সে হাতখানা তখনই জোর করিয়া টানিয়া লইতে পারিল না—কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল। তা ছাড়া ইহার মধ্যে যে দোষাবহ কিছু থাকিতে পারে তাহা ইন্দিরার পক্ষে জানা সম্ভবও নয়—

সে ভাবিতেছিল সুকুমারেরই কথা। বয়স তাহার অল্প হইলেও সে পাড়াগাঁয়ে ঈর্ষার অনেক কুৎসিত রূপই দেখিয়াছে, পুরুষের এমন নির্বিকার চেহারা তাহার কল্পনারও বাহিরে। সুকুমার কি চায়, সে এমন ইচ্ছা করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতেছে কেন?

তবে কি…তবে কি…

সমস্ত অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া এই সন্দেহটাই ইন্দিরার মনে আত্মপ্রকাশ করিল, তবে কি সুকুমারের আর তাহার সম্বন্ধে কোন মোহ নাই? আনন্দর অভিযোগটা সত্য নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু সে আর তাহার সঙ্গ, তাহার সাহচর্য্য কামনা করে না, বরং বিরক্তই হয়, তাই কি এ অবহেলা? তাই কি সে এত নির্বিকার?

ইন্দিরার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। এইবার সে মনে মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, এতদিন সে আত্মপ্রবঞ্চনাই করিয়া আসিয়াছে, সুকুমারের কাছে তাহারই বহুদিন আগে পরাজয় ঘটিয়াছে—। আজ সেই সুকুমারের ভালবাসার ইতিহাস জানিবার জন্য ব্যগ্র, যেমন ব্যগ্র একদিন ছিল সুকুমার নিজে—

সহসা আনন্দর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে ইন্দিরার চমক ভাঙ্গিল। তাহার হাতখানায় মৃদু চাপ দিয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে আনন্দ কহিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বৌদি, সত্যি জবাব দেবেন?

তাহার প্রশ্নে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেও ইন্দিরা কোন কথা কহিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। আনন্দ তবু একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু আমি আপনার কথা ভেবে স্থির থাকতে পারছি না ব'লেই জিজ্ঞাসা করছি, সুকুমার কি আপনাকে সুখী করতে পারে নি? ...না না, আপনি যতই গোপন করার চেষ্টা করুন, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে আপনি এখানে সুখে নেই—

ইন্দিরা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কথার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিল না। তাহার পর যখন বুঝিল, তখন হাতখানা সজোরে আনন্দর মুঠা হইতে টানিয়া লইয়া কহিল, এ সব কি বলছেন ঠাকুরপো? আমি ওঁর কাছে সুখে নেই এমন কথা কে আপনাকে বললে? ওঁর মত স্বামীর কাছে যে সুখে থাকতে না পারে সে আর কোথায় সুখ পাবে?...আপনি কি বোঝাতে চান আমি তা জানি, সেই জন্য ওঁর মত দেবতার নামেও আপনি তখন কুৎসিত ইঙ্গিত করছিলেন। ছি, ছি, এ সব কথা আর বলবেন না কখনো, শুনলেও যে পাপ হয়।

হয়ত এতটা উত্তেজনার কারণ ছিল না, কিন্তু এটা কতকটা ইন্দিরার আত্মগ্লানিরই তাপ।

আনন্দ অপ্রতিভ হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, মাপ করবেন, আমি অতটা বুঝতে পারিনি।

গাড়ি যখন মধুপুরে তাহাদের বাড়ীর সামনে পৌছিল তখন রাত্রি দশটা বাজে। সুকুমার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিমুখেই বলিল, এসো। আমার আর যাওয়া হ'লো না, লাহিড়ী মশায় যা পাকড়াও করলেন, কার সাধ্যি নাটক শেষ হবার আগে ওঠে।

ইন্দিরা আশা করিয়াছিল যে অন্তত এতখানি রাত করার জন্য সামান্য কিছু অনুযোগও সুকুমার করিবে কিন্তু সে সেদিক দিয়াই গেল না। বরং ক্লান্তমুখে আনন্দকে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া কহিল, আমায় খুব খোঁজাখুঁজি করেছিলি নাকি? আমি আবার ভাবছিলুম যে মিছামিছি তোরা হয়রান না হোস—ইন্দিরা আর শুনিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু কাপড় ছাড়ার নাম করিয়া ঘরে ঢুকিলেও তখনই সে কাপড় ছাড়িতে পারিল না, সেই অবস্থাতেই মিনিট-দশেক স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। কী যে সে ভাবিতেছিল তা সে-ও বোধ হয় স্পষ্ট জানে না, শুধু ভিতরে ভিতরে একটা অপরিসীম দাহ, একটা মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতেছিল। আনন্দর ইঙ্গিত সে বিশ্বাস করে নাই কিন্তু সেটা এক নূতন সম্ভাবনার আভাস দিয়াছে যেটার কথা আর কখনও সে ভাবে নাই। এবং সেই সম্ভাবনাই তাহার অন্তরকে দলিয়া পিষিয়া যেন অনড় করিয়া দিয়াছিল। ভাল করিয়া কিছু ভাবিবারও ক্ষমতা ছিল না, অবশেষে ঝি আসিয়া—রান্না শেষ হইয়াছে, এই সংবাদ দিতে তবে তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা বদলাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

সুকুমার বেশ সহজভাবেই আসিয়া আহারে বসিল। বলিল, আনন্দটার কি হলো আজ? ভয়ানক শরীর খারাপ ব'লে বাড়ি চলে গেল। কিছুতেই খেতে রাজি হ'লো না।...

ইন্দিরার মনে হইল ইহার চেয়ে তিরস্কার করাও ভাল ছিল। এমন অনিশ্চয়তা অসহ্য। তিরস্কার করিলে, রাগ করিলে তবু তাহার অর্থ পাওয়া যাইত—কিন্তু এই নির্বিকার অবস্থায় যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। সে কিছুতেই সেদিন মুখ তুলিয়া কাহারও পানে চাহিতে পারিল না। সে যেন কি একটা কঠিন অপরাধ

করিয়া ফেলিয়াছে—দাসী চাকরদের সহিত চোখোচোখি হইলেও পাছে সেখানে নীরব তিরস্কারের ভাষা দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সেদিন সে সাধ্যমত সকলকারই দৃষ্টি এড়াইয়া গেল। আহারের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, তবু আনন্দর না খাওয়ার সহিত তাহার না খাওয়ার কোন অর্থ হইতে পারে এই ভয়ে নিয়মমত আহারে বসিল কিন্তু কোন্ এই অজ্ঞাত অভিমান ও বেদনায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, প্রাণপণে চোখের জল চাপিয়া কোনমতে দুই-এক গ্রাস খাদ্য মুখে পুরিয়াই উঠিয়া পড়িল।...

রাত্রে বিছানায় শুইয়া কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিল না। স্বামীকে সে এ পর্য্যন্ত যত দুঃখ দিয়াছে আজ তাহার সবগুলিই যেন ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—এ অবস্থা অসহ্য। আজ সে বুঝিতে পারিল সে স্বামীর ভালবাসাকে অবহেলা করিতে পারিয়াছে তাঁহার প্রেমের গভীরতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল বলিয়াই—তাহার দম্ভ, অভিমান সব কিছু নির্ভর করিতেছে তাঁহারই উপর। কিন্তু সেই ভালোবাসার দম্ভে উন্মত্ত হইয়া আজ বুঝি সে মূলধনই হারাইতে বসিয়াছে। আসল মুহূর্তটিকে চিনিতে পারে নাই—যে মুহূর্তে তাহার আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল। আজ যদি উনিই অবহেলা করিতে শুরু করেন ?...

তাহার সমস্ত বুক ভাঙ্গিয়া যেন কান্না বাহির হইতে চাহিতেছে অথচ সে কাঁদিবেই বা কাহার কাছে ? কোন সহানুভূতির দরজাই ত সে খোলা রাখে নাই—। তখন যদি শাশুড়ীর কথা সে শুনিত !

সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। বহুক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া সুকুমারের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া তাহার পায়ের উপর হাত রাখিল।

সুকুমারও জাগিয়াছিল। বাহিরে সে যতই নির্বিকার থাক, অন্তরটা

তাহার জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে-ও মানুষ, অত রাত্রে স্ত্রীকে বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইয়া ফিরিতে দেখিলে, বিশেষত তাহারা যদি অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে ফেরে, কোন মানুষই স্থির থাকিতে পারে না। এই কয়দিন ধরিয়াই সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আজিকার ত কথাই নাই; তবু সে মনকে প্রাণপণে বুঝাইতেছে, যে ইহাই তাহার ন্যায্য প্রাপ্য। সতীশের প্রতি যে অন্যায় সে করিয়াছে, এ দহন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত—কঠিন পাপের কঠিন শাস্তি—এ ভোগ করিতেই হইবে। আর তাহাতে, তাহাতে যদি ইন্দিরা সুখী হয় ত হোক্—

কিন্তু মনকে প্রবোধ দেওয়া এক বস্তু আর প্রবোধ পাওয়া আর এক বস্তু। তাই সে অত রাত্রেও ঘুমাইতে পারে নাই। ওপাশে যে ইন্দিরাও জাগিয়া আছে তাহাও সে বুঝিয়াছিল কিন্তু সে অনিদ্রায় অন্য কারণ অনুমান করিয়া তাহার অন্তর্দাহ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এখন ইন্দিরাকে তাহারই শয্যায় আসিয়া পায়ে হাত দিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

এ কি ইন্দু! কি হয়েছে রাণী, ভয় পেয়েছো—?

সে উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে কাছে টানিয়া লইল।

অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে ইন্দিরা চুপি চুপি কহিল, আমি অত রাত ক'রে ফিরলুম, বকলে না কেন?

একি অদ্ভুত প্রশ্ন!

বিস্ময়ে সুকুমারের মুখ দিয়া কিছুক্ষণ কথাই বাহির হইল না। তাহার পর কহিল, বকব কেন? ওখান থেকে ফিরতে দেরি হবে তা ত আমি জানতুমই—

তবে পাঠালে কেন? কেন তুমি বাড়ীতে থেকেও বললে যে লাহিড়ী মশায়ের বাড়ীতে ছিলে—কেন তুমি অমন ক'রে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ?

তা বটে!

গভীর দুঃখের মধ্যেও সুকুমারের হাসি আসিল। এ অনুযোগ তাহারই প্রাপ্য বটে!

সে অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, তা নইলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না যে রাণু! যে পাপে তোমাকে পেলুম না, সে পাপের শেষ হওয়া চাইত!

অকস্মাৎ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ইন্দিরা তাহার বুকে মাথা রাখিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুকুমারের বুক দুলিয়া যেন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। একি সত্য, না সে স্বপ্ন দেখিতেছে?

কী হয়েছে রাণী, কেন অমন করছ? বলো আমাকে কি হয়েছে, লক্ষ্মীটি—

ইন্দিরা প্রায়-রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, আর কখনও অমন করব না, তুমি এই বারটি আমাকে মাপ করো—

কিন্তু তোমার কোন অপরাধই হয়নি যে। অপরাধ যে আমারই, তাই আমি এত শাস্তি পেলুম। তুমি শান্ত হও, অমন ক'রো না!

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া ইন্দিরা কহিল, না, না তোমার কোন অন্যায় নেই। আমার কাছে তোমার কোন পাপ থাকতে পারে না। তুমি আমাকে এইবারটি শুধু কাছে টেনে নাও, আর কখনও আমি ভুল করব না।

কঠিন বাহুবন্ধনে তাহাকে প্রায় নিষ্পেষিত করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি সুকুমার কহিল, আমি ত টেনে নিতেই চাই গো, তুমিই যে এতদিন কঠিন হয়ে ছিলে! কি ক'রে যে আমার দিন কেটেছে তা তুমি কোনদিন বুঝবে না।

ইন্দিরার বক্ষ তখনও কান্নার বেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে

শুধু মুখ তুলিয়া নিজেই সুকুমারের মুখে গালটা চাপিয়া দিয়া কহিল, আমি অহঙ্কারে পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, তুমি আমায় তখন শাস্তি দাওনি কেন?

সুকুমার কহিল, ও সব কথা এখন থাক্—।

তাহার পর ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, চলো আমরা কাল বাড়ি ফিরে যাই—। যাবে?

ইন্দিরা কহিল, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই যাবো। আমি আর কিছু জানি না।

—শেষ—